ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা

সৈয়দ নিজার

ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন
ও
সুলতানের
বিউপনিবেশায়ন ভাবনা

সৈয়দ নিজার

উৎসর্গ

উত্তর ও পূর্বপুরুষকে

সৈয়দ ছয়ফুল আলম
খোরশেদা বেগম চৌধুরী
সৈয়দ নিলাদ্রী ফ্রেয়া
সৈয়দ তরসী তিলোত্তমা

ভূমিকা

বেশ কয়েক বছর আগে বিশ শতকের প্রথমার্ধের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের একটি চিত্র প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হয়েছিল লন্ডনের টেইট মডার্ন গ্যালারিতে। সেখানে অন্যান্য শিল্পীদের চিত্রকর্মের মাঝে প্রতিচ্ছায়াবাদী (Impressionist) শিল্পী ক্লদ মোনের আঁকা *ফাম্ম আসিস সুর আ বাঙ্ক* (Femme assise sur un Banc, ১৮৭৪) দেখে মনে হচ্ছিল চিত্রটি অসম্পূর্ণ; কোনো এক অপরিপক্ব শিল্পীর আঁকা। উনিশ শতকের শেষের দিকে অনেক শিল্পরসিকও এমন সমালোচনা করেছেন। কিন্তু, ইউরোপীয় শিল্পচর্চার ইতিহাসের আলোকে দেখলে মনে হয়, চিত্রকর্মটি এক অসাধারণ শিল্পদর্শন, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও অঙ্কন-কৌশলের ফসল। রেনেসাঁর সময় ইউরোপীয় শিল্পীরা জগতের প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনের যে ব্রত নিয়েছিলেন, তারই সর্বোচ্চ বিকশিত রূপ এই প্রতিচ্ছায়াবাদ (Impressionism)। তাই শিল্পের মহত্ত্বের প্রশ্নে এই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় অবমূল্যায়নের ঝুঁকি থাকে।

সুলতান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের একজন। তার জীবন এবং কর্ম নিয়ে অনেক বই এবং প্রবন্ধ লেখা হলেও, ঐতিহাসিক ও সমকালীন প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতি এবং শিল্পদর্শনের আলোকে তার শিল্পকর্মের পাঠ এখনো দাঁড় করানো হয়নি। ফলে সুলতানের কাজ অবমূল্যায়নের ঝুঁকিতে না পড়লেও পূর্ণাঙ্গ পাঠ না থাকায় বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় তার প্রভাব নেই বললেই চলে। অথচ, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় সুলতানের শিল্পদর্শনের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল হওয়ার কথা।

ঔপনিবেশিকপর্বে বাংলাদেশ-ভারতের শিল্পচর্চা বিভিন্নভাবে ইউরোপীয় শিল্পধারা এবং নন্দনভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তা এখনো জারি আছে। এই প্রভাব এখানকার মূলধারার উপর সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। অন্যদিকে, উপনিবেশ এবং উপনিবেশোত্তর পর্বে ইউরোপীয় প্রভাব থেকে বের হয়ে আসার নজিরও পাওয়া যায়। সুলতান তাদেরই একজন। সুলতানের জন্ম ঔপনিবেশিকপর্বে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কলকাতা আর্ট কলেজে পঞ্চাশের দশকে। তখন বঙ্গীয় পুনর্জাগরণ বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্ব সর্বোচ্চ অবস্থায়।

১৯৪৭-এর পরে, কিছু কাল তিনি পাকিস্তান, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে ছিলেন। ষাটের দশকে তিনি চলে আসেন ঢাকায়। এমনটা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, সুলতানের চিন্তার ক্ষেত্রভূমি আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক। তাই সময়, স্থানিকতা এবং বৈশ্বিকতা বিবেচনায় নিয়ে সুলতানের শিল্পকর্মের পাঠ দাঁড় করানো প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। শুধু সুলতানের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলাদেশের কোনো শিল্পীকে নিয়েই এ ধরনের গবেষণা দেখা যায় না। যেটুকু হয়েছে তা আবার বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পচর্চা এবং পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী শিল্পের সাথে তুলনামূলক পাঠের বলয় থেকে বের হতে পারেনি। কিন্তু সুলতানের যথার্থ পাঠের জন্য প্রয়োজন তার চিন্তার ক্ষেত্রভূমি—ভারতশিল্পের ইতিহাস, ঔপনিবেশিকপর্বে শিল্পচর্চার প্রবণতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বিশ শতকের বৈশ্বিক শিল্পচর্চার আলোকে তার কাজের পাঠ।

সুলতানের শিল্পকর্ম এবং বিভিন্ন কথপোকথনে খণ্ডিতভাবে তার বিউপনিবেশায়ন ভাবনা উঠে এসেছে, তাই তার বিউপনিবেশায়ন ভবনার তত্ত্বায়ন প্রয়োজন। তাছাড়া, সুলতানের শিল্পকর্মগুলোকে বিউপনিবেশিত বললেই তা বিউপনিবেশিত হয় না। এ প্রসঙ্গে তার শিল্পকর্মগুলোর বিষয়বস্তু এবং অঙ্কনকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। আলোচনার প্রয়োজন কখন একটি শিল্পকে উপনিবেশিত বা বিউপনিবেশিত বলা যায়।

জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের চরিত্রগত, মাত্রাগত এবং পর্যায়গত রকমফের রয়েছে। রেনেসাঁ এবং পরবর্তী কয়েক শত বছর ইউরোপীয় চিন্তক এবং দার্শনিকগণ মনে করতেন শিল্পের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে তার বাস্তবতাকে উপস্থাপনের ক্ষমতা। প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় চিত্রকলা রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর না হওয়ার কারণে বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনের ক্ষমতা তার নেই। এই যুক্তিতে, ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে ভারতীয় চিত্রকলা উপস্থাপিত হয়েছে 'CRAFT' হিসাবে 'FINE ART' হিসাবে নয়। যা জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈধতা দিয়েছে ঔপনিবেশিক উন্নয়ন প্রস্তাবের। সেই প্রস্তাব হচ্ছে–ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের শিল্পচর্চা করতে হলে ইউরোপীয় রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত আত্মস্থ করতে হবে। ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয় শিল্পীরা তা-ই করেছেন এবং তা এখনো জারি আছে। প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ দুই-ই হওয়ার কথা ছিল এবং হয়েছে। ই. বি. হ্যাবেল, আনন্দ কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন ভারতশিল্প আধ্যাত্মিক-ভাব নির্ভর হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের চিত্রকলা পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর নয়। তা বিবেচনায় নিলে ভারতশিল্পও 'FINE ART' মর্যাদার দাবিদার। ভারতশিল্প 'আধ্যাত্মিক' তা সে

সময়কার প্রাচ্যতত্ত্বের অপরাপর জ্ঞানকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোনো দাবি নয়। সে সময় প্রাচ্যের দর্শন এবং সাহিত্যকেও ভাবা হত 'আধ্যাত্মিক'। এই বিবেচনায় আধ্যাত্মিকতা হওয়া উচিত বিউপনিবেশিত ভারতশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। এই ভাবনা আজও সক্রিয় রয়েছে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের জ্ঞানকাণ্ডে। সুলতানের বিষয় আধ্যাত্মিক নয়। এ বিবেচনায় সুলতানের শিল্পকর্ম বিউপনিবেশিতও নয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের শিল্পসমালোচকগণ মনে করেন সুলতানের শিল্পকর্ম পাশ্চাত্য-ব্যাকরণ সিদ্ধও নয়। এ অবস্থায় যৌক্তিক ভাবে চারটি সম্ভবনা রয়েছে- (১) সুলতানের শিল্পকর্ম উপনিবেশিত কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য কৌশলে অদক্ষ, অথবা, (২) সুলতানের শিল্পকর্ম বিউপনিবেশিত কিন্তু হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পের পাঠ যথার্থ নয়, অথবা (৩) সুলতানের শিল্পকর্ম উপনিবেশিত এবং বিউপনিবেশিত, সেক্ষেত্রে সুলতানের শিল্পকর্মে দ্বৈত চিত্তের ইঙ্গিত থাকবে, অথবা (৪) সুলতানের শিল্পকর্ম উপনিবেশিতও নয় বিউপনিবেশিতও নয়, অর্থাৎ ভারতশিল্পের কোনো বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা তার শিল্পকর্মে নেই। এই সকল সম্ভবনা বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তবে মীমাংসিত হয়েছে দ্বিতীয় সম্ভাবনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ সুলতানের শিল্পকর্ম বিউপনিবেশিত কিন্তু হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পের পাঠ যথার্থ নয়।

তার অন্যতম কারণ হল আঠারো শতক থেকে ইউরোপীর দর্শন এবং বিজ্ঞানের যুক্তি নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে যা এক পর্যায়ে ইউরোপের আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে পরিণত হয়। তাই, ইউরোপীয় চিন্তকরা মনে করতেন; সম্ভবত এখনো অনেকে মনে করেন–প্রতীচ্য যুক্তিবাদী এবং অপরাপর সকলেই অযুক্তিবাদী। অন্যদিকে, প্রাচ্যতত্ত্বে 'যুক্তিবাদ'-এর প্রতিষেধ করা হয় 'অধ্যাত্ম'। এর একটা কারণ হতে পারে–আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মূলধারায় প্রায় প্রতিষ্ঠিত যে 'অধ্যাত্মবাদ' যুক্তি নির্ভর নয়। তাই, প্রাচ্যতত্ত্বে প্রতীচ্য 'যুক্তিবাদী' এবং প্রাচ্য 'আধ্যাত্মিক' ধারণাটি ক্রিয়াশীল ছিল এবং আছে। প্রতিষেধ-নির্ভর এই নির্মিত আত্মপরিচয় ঔপনিবেশিক শাসন এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতেও ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকে অবশ্য মনে করেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এবং প্রাচ্যবাদ একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। এ অঞ্চলের চিন্তার সামান্যলক্ষণ 'আধ্যাত্মিকতা' ভাবা ভুল হবে। এ অঞ্চলের দর্শনে যুক্তিনির্ভর চিন্তার ছড়াছড়ি, সে কারণে প্রাচ্যতত্ত্বে সচেতনভাবে বাদ দেয়া হয় অথবা বিকৃত করা হয় এ অঞ্চলের দর্শন, শিল্প এবং সাহিত্যের আধ্যাত্মিক নয় এমন সকল নিদর্শনকে।

বর্তমান গ্রন্থে একাধারে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যবাদের যেমন সমালোচনা করা হয়েছে তেমনি কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে–ভারতশিল্প এবং ইউরোপীয়শিল্প

উভয়ই বাস্তববাদী কিন্তু তাদের অভিমুখিতা ভিন্ন। ভারতশিল্পে অভিমুখিতা হচ্ছে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক শিল্পচর্চা, অন্যদিকে রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপীয় মূলধারার শিল্পচর্চার অভিমুখিতা হচ্ছে ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক। তবে এই অভিমুখিতা উত্তর-প্রতিচ্ছায়াবাদী ধারাগুলোর মধ্যে সক্রিয় নয় কিন্তু তার প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া, ভারতশিল্প এবং ইউরোপীয় শিল্পধারার মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্যই মৌলিক নয়, সেগুলোর সৃষ্টি হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক ধারণার পার্থক্যের কারণে। এই প্রস্তাব মূলধারার পাঠ থেকে ভিন্ন। তাই তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একদিকে যেমন ইউরোপীয় শিল্পচর্চার একটি দার্শনিক পাঠ দাঁড় করানো হয়েছে ঠিক তেমনি ভারতীয় শিল্পচর্চারও একটি দার্শনিক পাঠ দাঁড় করানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এ অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি না করে শিল্প বিষয়ক সংস্কৃত সূত্র সাহিত্যের উপরও নির্ভর করা হয়েছে। তাছাড়া, এই প্রস্তাবের পক্ষে দালিলিক প্রমাণের জন্য গুপ্ত যুগের প্রথম দিকে নগ্নজিতের লেখা *চিত্রলক্ষণ*, পঞ্চম শতকে রচিত *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ* এবং গুপ্তযুগের শেষের দিকে বরাহমিহিরের লেখা *বৃহৎ সংহিতায়* মানব দেহের ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক যে মাপ দেয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ দেহ অঙ্কন করা হয়েছে এবং তার তুলনা করা হয়েছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'ভিট্রুভিয়ান ম্যান' (Vitruvian Man) এর সাথে। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে সুলতানের শিল্পকর্মে ভারতশিল্পের অভিমুখিতা বর্তমান হওয়ার কারণে তা বিউপনিবেশিত। উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়া, বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে এ অঞ্চলের শিল্পকলার উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া এবং তার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি, ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশোত্তর পর্বে বিউপনিবেশায়ন ভাবনা, জাতীয় এবং আত্ম-পরিচয়ের রাজনীতিসহ সুলতানের বাংলাদেশশিল্পের বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব।

এ অঞ্চলের জ্ঞানকাণ্ডে উপনিবেশের প্রভাব এবং বিউপনিবেশায়ন তৎপরতা নিয়ে দারুণ সব গবেষণা হয়েছে। তারপরও দার্শনিক অনুসন্ধান কম থাকার কারণে বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বের দার্শনিক দুর্বলতা রয়ে গেছে। তার কারণ শুধু উত্তর-কাঠামোবাদের উপর নির্ভরশীলতা নয়। যদিও একথা সত্য যে দু-চার জন বিউপনিবেশায়ন তাত্ত্বিকের উত্তর-কাঠামোবাদের উপর নির্ভরশীলতা দেখলে প্রশ্ন আসতেই পারে বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব কতটা বিউনিবেশিত। এ বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা হয়নি কিন্তু সচেতনতা ছিল। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, আঞ্চলিক বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বেশিদিন হয়নি। বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব নিয়ে সদ্য আলোচনা শুরু হয়েছে; তা যে এখনো অপরিপক্ব তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুলতান নিয়ে আমার পাঠ এবং পঠন দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে জৈবদেহের মত বিকাশ লাভ করেছে এবং তার সাথে বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বনির্মাণের প্রত্যয়ও ছিল ক্রিয়াশীল। তত্ত্ব অনেক সময় আমাদের দৃষ্টিকে রোধ করে, অন্যদিকে তত্ত্বহীন গবেষণায় তথ্যের এলোপাথাড়ি দৌড় সামলানো কঠিন হয়। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান গবেষণায় সুলতানের শিল্পভাবনা যেমন তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে তেমনি বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বও খানিকটা তথ্যের লাগামহীন দৌড়কে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই বলা যেতে পারে অপরিপক্ব তত্ত্বের দুর্বলতা এই গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ মূলধন।

বাংলাদেশে ইংরেজি বইয়ের গ্রন্থপঞ্জি তৈরির ক্ষেত্রে Harvardian, MLA অথবা APA পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলা বইয়ের গ্রন্থপঞ্জি তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। উপরন্তু, বিদেশি পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কিছু সমস্যাও দেখা দেয়, যেমন বাংলাদেশের বড় সংখ্যক লেখকের শেষ নামে 'ইসলাম' বা 'আহমেদ' থাকায় পাঠকের পক্ষে গ্রন্থপঞ্জি না দেখে বোঝার উপায় থাকে না যে কোন 'ইসলাম' বা কোন 'আহমেদ'-এর কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, সম্পূর্ণ নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো—কোনো কোনো লেখকের নাম যথেষ্ট দীর্ঘ এবং যৌথ লেখকের ক্ষেত্রে তা দৃষ্টিকটু লাগে। বাংলা নামের কাঠামো বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। এ বিষয়ে বাংলাদেশের জ্ঞানজগতে আলোচনা জারি আছে। তাই, এই বইয়ে দেশজ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে বাংলা বইয়ের গ্রন্থপঞ্জি তৈরির ক্ষেত্রে একটি সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা একই সাথে বাংলা বইয়ের গ্রন্থপঞ্জি তৈরির একটি প্রস্তাব।

২০১৩ সালে 'সুলতান, প্রান্তের প্রান্তিক এবং দেশজ নন্দনভাবনা' শিরোনামে একটি গবেষণা করি। গবেষণাটি অর্থায়ন করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। গবেষণাটির অংশবিশেষ প্রকাশিত হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণা জার্নাল *নৃবিজ্ঞান পত্রিকায়*; অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান প্রবন্ধটির পাঠোত্তর পর্যালোচনা করেছিলেন। তার পর্যালোচনা লেখাটিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছিল। পরবর্তীতে, কিছু অংশ আন্তর্জাতিক দ্বিবার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনী কক্সবাজার (*International Art Biennale Cox's Bazar,* ২০১৫)-এর সমাপনী বক্তৃতায় পাঠ করার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিল্পী এবং শিল্পরসিকদের সাথে আলাপ গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছে, একই সঙ্গে লেখাটির প্রাণবন্ত বিকাশেও সহায়তা করেছে। তবে কিছু নাম উল্লেখ না করলেই নয় যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন। তারা হচ্ছেন মোস্তাক আহমাদ দীন, হিমেল বরকত, মোস্তফা জামান, ফিরোজ আহমেদ,

আমিরুল রাজীব, মিসবাহ উদ্দিন, সামজীর আহমেদ এবং তানভীর আকন্দ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি প্রকাশক রাজীব চৌধুরীকে যার তাড়া ছাড়া এই বই কখনো প্রকাশিত হতো না।

সর্বোপরি যার কথা না বললেই নয় তিনি আমার স্ত্রী রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা। তিনি আমার চিন্তার প্রথম শ্রোতা, তিনি আমার লেখার প্রথম পাঠক এবং সমালোচক। তার সহযোগিতা ছাড়া আমার অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতো না।

সৈয়দ নিজার
দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

সুলতান

Human beings are not born once and for all on the day their mothers give birth to them, but life obliges them over and over again to give birth to themselves.

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

শেখ মুহাম্মদ সুলতান বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের একজন। তিনি শুধু চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, তার স্বতন্ত্র দর্শন, রাজনীতি, সমাজ ও নন্দনভাবনা ছিল, যা একই সাথে দেশজ ও সময়ের চেয়ে অগ্রগামী এবং জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে 'সহজিয়া'দের 'সহজ' হয়ে ওঠার অক্লান্ত প্রচেষ্টার স্মারক। তার চিন্তার ছাপ পড়তে পারত আমাদের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ ও দর্শনচর্চাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু তার চিন্তা জ্ঞানের অন্যান্য শাখা তো দূরের কথা, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় কোনো ধারাক্রমই সৃষ্টি করতে পারেনি বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীকে প্রভাবিতও করতে পারেনি। কখনও কখনও সুলতানের কাজ অনেক শিল্প-সমালোচকদের কাছে অবোধগম্য ছিল বলে তা অবমূল্যায়িত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে প্রদর্শিত সুলতানের শিল্পকর্মের অন্যতম বিষয়বস্তু হচ্ছে 'আত্মসত্তা'। আত্মসত্তার অন্বেষণের অভিপ্রায় এবং প্রচেষ্টা পূর্বে থাকলেও তা মূর্ত হয়েছে কেবল স্বাধীনতা-উত্তর প্রদর্শিত শিল্পকর্মে। তিনি তার চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন দেশজ নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলার রূপ। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পকলা উপনিবেশের উত্তরাধিকার। আমাদের সমকালীন নন্দনভাবনা ও শিল্পচর্চা গভীরভাবে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলা দ্বারা প্রভাবিত। এদেশের শিল্পচর্চার ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সুলতানের কর্মে দেশজ শিল্পের যে রূপ ধরা পড়েছে তা এদেশের শিল্পরসিক ও শিল্পীদের অনেকেই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সে কারণে সুলতানের কোনো উত্তরসূরি নেই। নেই কোনো ধারা। কিন্তু তার শিল্পকর্মে বিউপনিবেশায়নের পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা শুধু শিল্পের বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাবই নয় বরং জ্ঞানের যে কোনো ধারার বিউপনিবেশায়নের পদ্ধতি হিসেবেও বিবেচ্য হতে পারে।

সুলতান ১৯২৩ সালের ১০ আগস্ট বৃহত্তর যশোর জেলার নড়াইল থানার মাসুমদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাক নাম 'লাল মিয়া'। তার বাবার নাম শেখ মেসের আলী এবং মায়ের নাম মাজু বিবি। বাবা প্রান্তিক মুসলমান, পেশায় রাজমিস্ত্রি। সুলতান ১৯২৮ সালে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হলেও অভাব-অনটনে ১৯৩৩ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় স্কুল ত্যাগ করেন। সে সময় কিছুকাল যোগালির কাজ করেছেন বাবার সাথে।

ছোটবেলা থেকেই সুলতানের ছবি আঁকার আগ্রহ ছিল। নড়াইলের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় তার সহজাত ড্রয়িং দেখে মুগ্ধ হন। পরবর্তীকালে ১৯৩৮ সালের দিকে ধীরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় অঙ্কন বিদ্যায় শিক্ষা নিতে সুলতান কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা তার ছিল না। সে জন্য

তিনি ১৯৪০ সালের দিকে শিল্পানুরাগী শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সুপারিশের মাধ্যমে কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালের দিকে শিক্ষা-জীবন শেষ না করে তিনি ভারত দেখতে বের হয়ে পড়েন। সুলতান আর্ট কলেজে ছিলেন তিন বছর। প্রথম বছর তিনি ক্লাসে দ্বিতীয় হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে হয়েছিলেন প্রথম।

সুলতান এক আলাপচারিতায় বলেছিলেন, সৎ মায়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। সম্ভবত বাড়ি ফেরার তাড়া এবং জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর প্রবণতা সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল। সে কারণে আর্ট কলেজে বেশিদিন তার থাকা হয়নি। নিরুদ্দেশ হয়েছেন বহুবার। ১৯৪৪ সালের দিকে তিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। দিল্লি থেকে আগ্রা, সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ থেকে সিমলা ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। আর জীবিকা নির্বাহ করেছেন ছবি এঁকে।

সিমলায় ছবি বিক্রির সুবাদে সুলতানের পরিচয় হয় এক ইংরেজ মহিলার সাথে। সেই ইংরেজ মহিলা তার এতিমখানার অর্থ সংগ্রহের জন্য সুলতানের ছবি প্রদর্শনী এবং বিক্রির ব্যবস্থা করেন। তাই ১৯৪৬ সালে সিমলাতেই তার প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কাপুরথালার মহারাজা। সে সময়ে আঁকা প্রায় সকল ছবিই হারিয়ে গেছে। তবে তার ব্যক্তিগত বয়ান থেকে জানা যায়– প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিই ছিল ইউরোপীয় ধাঁচে জলরঙে আঁকা, সাথে কিছু স্কেচ ও ড্রয়িংও ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন কাশ্মিরে এবং মনোযোগী ছিলেন সেখানকার নিসর্গ চিত্রায়ণে। এ কালপর্বের সব ছবি হারিয়ে গেছে। তবে সুলতান বিভিন্ন আলাপচারিতায় জানিয়েছেন, এই পর্বের অধিকাংশ ছবিই তেলরঙে আঁকা এবং সবই খুব রঙিন ও উচ্চকিত বর্ণিল ছিল। এসব ছবিতে গভীর বেগুনি রঙের পর্বত, বিচিত্র ঝোঁপঝাড়, বৃক্ষ, হ্রদ, নদী এবং নিসর্গের অংশ হিসেবে মানুষ চিত্রিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসানের পরপর কাশ্মিরে রাজনৈতিক অবস্থা অবনতির দিকে যায়। পাকিস্তান সরকার কাশ্মিরে আক্রমণ করলে ভারত সরকারও কাশ্মিরে আক্রমণ করে। ফলে পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে তিনি নিরাপত্তার খাতিরে দ্রুত পাকিস্তানে চলে যান। যাওয়ার সময় কাশ্মিরে আঁকা ছবিগুলো তিনি সাথে নিয়ে যেতে পারেননি। পরবর্তীকালে স্মৃতি থেকে তিনি এই পর্বের কিছু ছবি পুনরায় এঁকেছিলেন, যার দু-একটি ছবি বিভিন্ন বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে। তবে, সিমলা এবং কাশ্মিরের আঁকা ছবিগুলো পাওয়া গেলে শিল্পী সুলতানের বিকাশ-অধ্যয়নে সহায়ক হতো।

এস এম সুলতান, নিসর্গ-১, তেলরং, ৭৫×৫৫ সেমি, ১৯৫১
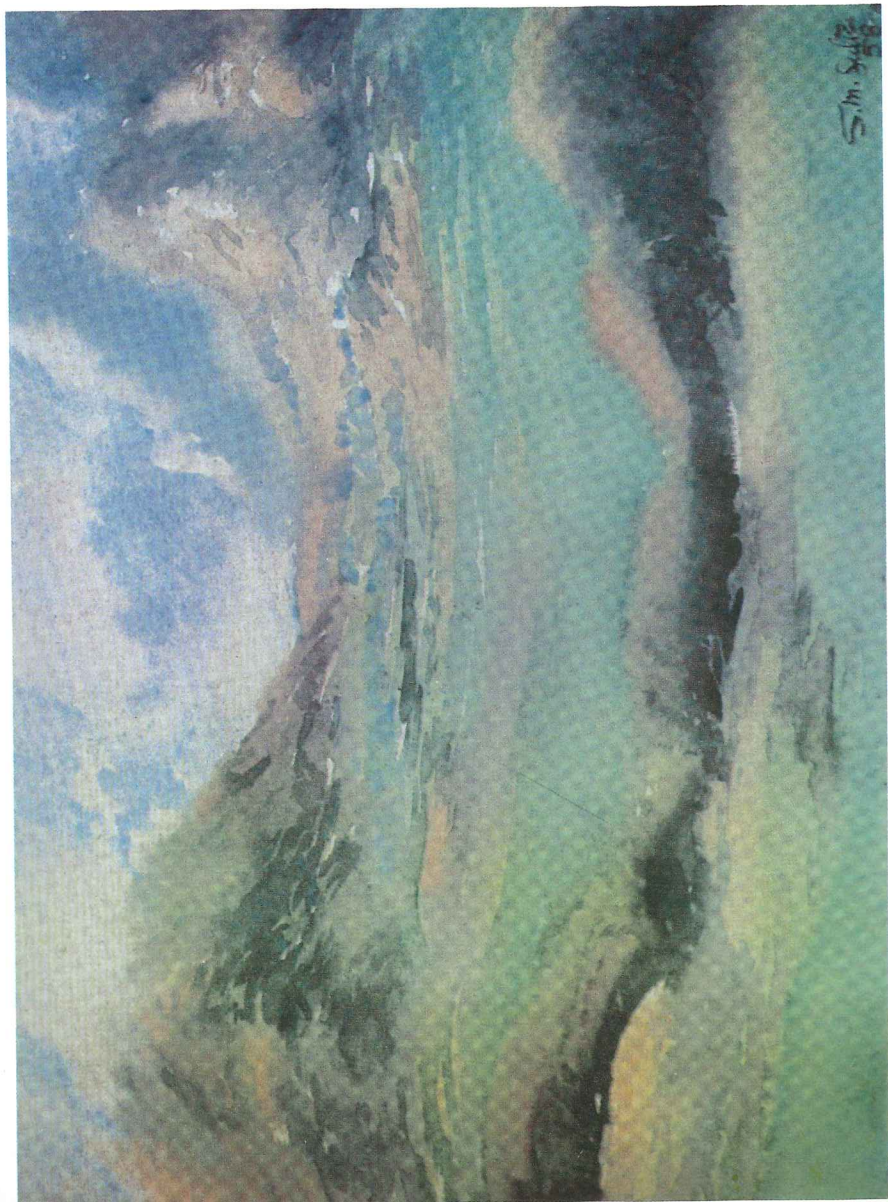
এস এম সুলতান, নিসর্গ-২, তেলরং, ৫০×৬৬ সেমি, ১৯৫৮

১৯৪৭ সাল থেকে তিনি পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থান করেন। সেখানে সুলতান একাধিক একক প্রদর্শনী করেন। পরবর্তীকালে ভ্রমণ করেন ইউরোপ এবং আমেরিকা। এ সময়ে তার শিল্পকর্মের একাধিক একক ও যৌথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডনে এক প্রদর্শনীতে তার শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয় পিকাসো, কর্নেট, মাতিস, ডুফি, দালি এবং ক্লের মতো শিল্পীদের সাথে। এশিয়াতে তিনিই প্রথম— যার ছবি আধুনিক শিল্পগুরুদের চিত্রকর্মের সাথে একত্রে প্রদর্শিত হয়।

এই অসাধারণ সাফল্যের পর ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে তিনি নড়াইলে ফিরে আসেন। এ সময় গ্রামের শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন শেখানোর লক্ষ্যে তিনি যশোর ও নড়াইলে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালপর্বে তিনি প্রায় এক দশক আঁকাআঁকি থেকে স্বেচ্ছাদূরত্ব বজায় রাখেন। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৭৬ সালের দিকে ঢাকায় তার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রদর্শিত চিত্রকর্মগুলোর ক্যানভাস ছিল বিশাল; প্রায় ৩০-৪০ ফুট লম্বা। তখনকার দর্শকদের কেউ তখনও এত বড় ক্যানভাস দেখেনি। ফলে তা তৎকালীন শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময় আঙ্গিকগত ও বক্তব্যগত দিক থেকে তার কাজের ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তখন তার ছবির মূল বিষয়বস্তু নিসর্গ থেকে সরে গিয়ে হয়ে ওঠে 'মানুষ'— গ্রামের প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষ, তাদের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, হাজার বছরের শোষণ-নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকার মহাবয়ান। চিত্রশিল্পী ও সমালোচক আবুল মনসুর সুলতানের পরিণত বয়সের সাথে তরুণ বয়সের কাজের তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন– 'সুলতানের চিত্রকলা দৃষ্টিসম্মুখে প্রথম যে অভিঘাতটি তৈরি করে তা হলো একটি বিস্ফোরণোন্মুখ শক্তির প্রকাশ ও মন্যুমেন্টালিটি বা সমুন্নত ভাব। বিস্তীর্ণ গ্রামীণ পটভূমি নিয়ে আঁকা হলেও তার ছবির মূল থিম মানুষ, প্রকৃতি এসেছে নেহায়েত পটভূমি বা অনুষঙ্গ হিসেবে।' [উদ্ধৃত হয়েছে– সাদেক, ২০০৩: ৪৩]

১৯৮৭ সালে গ্যেটে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে সুলতানের আরেকটি প্রদর্শনী হয়। এটি তার জীবদ্দশায় শেষ প্রদর্শনী। ১৯৯৪ সালের ১০ আগস্ট তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৮৭ সালের প্রদর্শনী এদেশের শিল্পরসিকদের নজর কাড়ে। কিন্তু তিনি তাদের অনেকের কাছে আবোধ্য রয়ে গেছেন। উপরন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পবোদ্ধা ও রসিকদের কাছে তার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক ধরা পড়েছে 'অনাধুনিক' বা 'নাইভ' হিসাবে। শিল্পরসিক এবং নগরপরিকল্পনাবিদ নজরুল ইসলাম সুলতানের সাথে কামরুল হাসান এবং জয়নুল আবেদিনের তুলনা করতে গিয়ে বলেন—

> অবশ্য জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান, উভয়েই সুলতানের তুলনায় প্রচলিত অর্থে অনেক বেশি ব্যাকরণসিদ্ধ আধুনিক ছবি এঁকেছেন। সুলতান সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই অনাধুনিক বা 'নাইভ' প্রকৃতির ছবি আঁকেন।
>
> [নজরুল, ২০০৯: ১১০]

নজরুল ইসলাম সুলতানের অঙ্কনরীতিকে 'অনাধুনিক' বা 'নাইভ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অনেকে হয়ত মীজানুর রহমানের সুরে বলবেন, আসলে 'নির্দোষ ঈর্ষা এবং পরশ্রীকাতরতার' বলি হয়েছেন সুলতান। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক পাঠ প্রয়োজন। আমাদের দেশের অধিকাংশ তাত্ত্বিক আধুনিকতাকে শুধু ধারা হিসাবে চিহ্নিত করেন না, তারা ভাবেন আধুনিকতা আমাদের সময়ের সার্বিক এবং বৈশ্বিক অভিব্যক্তি। তাই অনাধুনিক হওয়া মানে পিছিয়ে পড়া। আমাদের এই মনস্তত্ত্ব নির্মিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনামলে। সুলতানের কাজ সেই মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি বয়ান। তাই সুলতানের শিল্পচৈতন্য এবং বিউপনিবেশায়ন ভাবনা আমাদেরকে বুঝতে হবে— ভারতীয় চিত্রকলার উপনিবেশায়ন এবং বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় পুনর্জাগরণবাদের বিউপনিবেশায়নের তৎপরতার আলোকে। সে সম্পর্কে আলাপের আগে বিউপনিবেশায়ন কী তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

২

প্রসঙ্গ বিউপনিবেশায়ন

আমাদের দেশের অনেকে মনে করেন শিল্পীরা অপ্রকৃতিস্থ বা সমাজ বহির্ভূত, কিন্তু আসলে তারা সব বিষয়ে সজাগ এবং সচেতন।

শেখ মুহাম্মদ সুলতান

উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জাতিগোষ্ঠী অপর একটি রাষ্ট্র বা জাতিগোষ্ঠীর উপর সরাসরি সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে উপনিবেশ স্থাপন করে। এ ধরনের উপনিবেশায়নকে তাত্ত্বিক আলোচনায় সরাসরি বা প্রত্যক্ষ উপনিবেশায়ন বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ষোড়শ শতক-উত্তর ইউরোপীয় উপনিবেশের নতুন মাত্রা ছিল। তার প্রভাব কেবল সামরিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, ছিল মনস্তাত্ত্বিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রভাবও। এই ধরনের উপনিবেশায়নের বহুমাত্রিক প্রভাব পড়ে উপনিবেশিতের ভাষা, চিন্তা, দর্শন, শিল্পসহ অন্যান্য রুচিবোধে। ফলে, উপনিবেশিত যেমন অতিমূল্যায়ন করে উপনিবেশকের সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাষাসহ জীবনের অন্যান্য দিকগুলোকে, তেমনি হয়ে ওঠে অনুকরণপ্রিয়। সে কারণে ঘটেছে আত্মসত্তা থেকে বিচ্ছেদ। ভারতবর্ষে দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন আমলে ভাষা এবং সংস্কৃতির মাঝেই উপনিবেশায়ন সীমাবদ্ধ ছিল না, শিল্পভাবনা এবং চর্চাও প্রভাবিত হয়েছে ইউরোপীয় শিল্পদর্শন দ্বারা। ফলে, উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি এবং আত্মসত্তার বি-বিচ্ছেদায়নের [বিস্তারিত- ৬.১.৩] প্রচেষ্টাকে বিউপনিবেশায়ন তৎপরতা বলা যেতে পারে। যদিও বিউপনিবেশায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া।

বিউপনিবেশায়ন যদি উপনিবেশায়নের সমাপ্তি এবং আত্মসত্তার বি-বিচ্ছেদায়নের প্রচেষ্টা হয়, তাতে তত্ত্বীয় সমস্যা না থাকলেও প্রায়োগিক সমস্যা থেকে যায়। আত্মসত্তার কোনো বিশেষ রূপ নেই। তা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিশেষ কালে তার কোনো সামান্য চিত্র নেই। সময়ের সাথে সাথে তা পরিবর্তনশীল এবং প্রয়োজনের সাপেক্ষে তা সবসময় নির্মাণাধীন, যে প্রয়োজন আবার ভৌগোলিক এবং কালিক। ঔপনিবেশিক আমলে ক্ষমতার প্রভাবে আত্মসত্তার বিভিন্ন ধরন এবং মাত্রায় বিচ্ছেদায়ন হয়েছে। তাই, বি-বিচ্ছেদায়নই হচ্ছে বিউপনিবেশায়ন। বিউপনিবেশায়ন এবং উত্তর-উপনিবেশবাদ এক নয়। উত্তর-উপনিবেশবাদ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর শিল্প-সাহিত্য-চিন্তার অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির মধ্যে বিউপনিবেশায়নের প্রবণতা থাকলেও তা যেমন একমাত্র প্রবণতা নয়, তেমনি সার্বিক কোনো চরিত্রও বলা যায় না। বিউপনিবেশায়নের শুরু উপনিবেশায়নের জন্ম থেকে। এটি একটি সচেতন বিষয়ী প্রক্রিয়া, যার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে উপনিবেশায়নের প্রভাবগুলো চিহ্নিত করে তা মাড়িয়ে ওঠা। যেহেতু ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড বিশ্বজুড়ে সার্বিক না হলেও আমাদের কাছে বৈশ্বিক রূপে আবির্ভূত হয়, তাই বিউপনিবেশায়ন মানে দরজা-জানালা বন্ধ করে প্রাক-ঔপনিবেশিক মননে ফিরে যাওয়া নয়। বাস্তবে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিউপনিবেশায়ন সম্ভব নয়। সে কারণে বিউপনিবেশায়নকে প্রাক-ঔপনিবেশিক

ভাবনাগুলোর সৃষ্টিশীল বৈশ্বিক রূপান্তর বলা যেতে পারে। সে কারণে বিউপনিবেশায়ন আত্মসত্তার বি-বিচ্ছেদায়নের একটি বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা। উপনিবেশের ছাপ এবং বিকৃতিগুলো চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণ প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তানির্ভর হলেও বিউপনিবেশায়নের বিশেষ কোনো রূপরেখা নেই। তা সক্রিয় ব্যক্তি, সমাজ এবং রাজনীতি সাপেক্ষ। তাই, বিউপনিবেশায়নকে আত্মসত্তার বি-বিচ্ছেদায়নের একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে।

২.১. ভারতশিল্প আধ্যাত্মিক না বাস্তববাদী

ভারতশিল্পের বিউপনিবেশায়নের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োজন উপনিবেশায়নের প্রভাব চিহ্নিতকরণ— যা একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এই প্রভাবের শুরু হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে। এই প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ই. বি. হ্যাবেল, আনন্দ কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাদের ভারতশিল্প পাঠ এবং পঠনে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি আর্যতত্ত্ব এবং শিল্পকলার বিকাশতত্ত্বসহ তৎকালীন পাশ্চাত্য জ্ঞানজগতের বিস্তর প্রভাব লক্ষ করা যায়। তারা পাশ্চাত্য জ্ঞানকাঠামোর মধ্যে থেকে ভারতশিল্পের চরিত্র অধ্যয়ন করেছেন। ফলে প্রাচ্যতত্ত্বে অপরাপর জ্ঞানকাণ্ডের মতো ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে প্রতিষেধায়ন[১] প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে। পাশ্চাত্য তার উপনিবেশিত অপরকে চিহ্নিত করেছে বর্বর-অসভ্য-দায়িত্বহীন রূপে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে যুক্তিবাদী, সভ্য এবং দায়িত্ববান রূপে [Said, ১৯৯৫ [১৯৭৫]: ৮০][২]। একই ধরনের চরিত্র লক্ষ করা যায় ভারতশিল্প পাঠে। উনিশ শতকে ইউরোপীয় গবেষকদের কাজেই ভারতশিল্প উপস্থাপিত হয়েছে আদিম-অশ্লীল-বর্বর রূপে। সে সময়কার ইউরোপীয় শিল্পরসিক এবং গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হ্যাবেল বলেন–

> The Indian Institute at Oxford, give one the impresion that all Indian sculpture is barbarous, dreene, or trivial, and that painting as a fine art is almost unknown in India. This is also the impression which the great majority of Anglo-Indians bring back with them to Europe.
>
> [Havell, ১৯০৮: ১০]

---

[১] ‘ প্রতিষেধ হচ্ছে বাক্য বা পদের নিষেধ করা যেমন ‘জগত শাশ্বত’ এর প্রতিষেধ হচ্ছে ‘জগত অশাশ্বত’। ভারতীয় যুক্তিবিদ্যায় দুই ধরনের প্রতিষেধের উল্লেখ রয়েছে–পর্যুদাস প্রতিষেধ এবং প্রসজ্য প্রতিষেধ। দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ বিকল্পের একটিকে প্রতিষেধ করে অপরটিকে গ্রহণ করাকে পর্যুদাস প্রতিষেধ বলে। অপরদিকে প্রসজ্য প্রতিষেধ প্রয়োগকারীর লক্ষ্য কোনো বিকল্পকে খণ্ডন করে বিরুদ্ধ বিকল্পকে প্রতিষ্ঠা করা নয়। বর্তমান আলোচনায় ‘পর্যুদাস প্রতিষেধ’ অর্থে ‘প্রতিষেধ’ ব্যবহার করা হয়েছে।

[২] ‘The oriental is irrational, depraved (fallen), childlike, “different”; thus the European is rational, virtuous, mature, “normal”.’ [Said, ১৯৯৫[১৯৭৫]: ৮০]

অরবিন্দ ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণাণ, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতো অনেকে যেমন মনে করেছেন ভারতীয় দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'আধ্যাত্মিকতা', ঠিক তেমনি হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথও ভেবেছেন ভারতশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য 'আধ্যাত্মিকতা'। রাধাকৃষ্ণাণ বা সুরেন্দ্রনাথের ভারতীয় দর্শনের এই পাঠ আত্মপরিচয়ের রাজনীতি এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাথে যুক্ত, যা পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে।

ইউরোপ প্রতিষেধায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের আত্মপরিচয় নির্মাণ করেছে– তারা 'যুক্তিবাদী' এবং আমরা 'অযুক্তিবাদী'। কৃষি বা ইমারত নয়, যুক্তিবাদিতা হয়ে ওঠে সভ্য থেকে অসভ্যদের পৃথকীকরণের ভিত্তি। এরকম চিন্তা উৎসারিত হয়েছিল উপনিবেশবাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি থেকে। তাদের এ ভিত্তি অনুসারে শুধু সভ্য জাতিই মননের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে যুক্তিবিদ্যা চর্চা এবং আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে; কোনো বর্বর বা প্রায়-বর্বর জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এধরনের চর্চা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে না। এই বর্বর বা প্রায়-বর্বর জাতি গোষ্ঠীকে মননশীল ও সভ্য করে তোলাই তাদের নৈতিক দায়িত্ব [বিস্তারিত- নিজার, ২০১৩: ২০০]। প্রাচ্যতত্ত্বে সেই যুক্তিবাদিতার প্রতিষেধকে আত্মপরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হল। তবে, এখানে 'অযুক্তি'র স্থান নিল 'অধ্যাত্ম'। যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে আধ্যাত্মিকতায় যুক্তি অনুপস্থিত ভাবা হয়।

এ অঞ্চলের চিন্তার সামান্যচিত্রকে আধ্যাত্মিকতা ভাবা ভুল হবে, কারণ এখানে যুক্তিচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানচর্চার ইতিহাস। বৈদিক সাহিত্যে *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* এবং *অভিধম্ম পিটক*-এ দার্শনিক আলোচনায় যুক্তির পরিষ্কার ব্যবহার দেখা গেলেও যুক্তিবিদ্যা নিয়ে আদি গ্রন্থসমূহ হলো : *কথাভত্থু*, *চরক সংহিতা* এবং *ন্যায়সূত্র*। এই গ্রন্থসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচিত, সমালোচিত ও বিশ্লেষিত হয় দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি, অসঙ্গ, বাচস্পতি, গঙ্গেষ, কুমারিল, রঘুনাথ শিরোমণি এবং সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবিদ অন্নম ভট্ট ছাড়াও আরো অনেকের লেখায়, যা পরবর্তীকালে জন্ম দেয় প্রাচীন-ন্যায়, বৌদ্ধ-ন্যায়, জৈন-ন্যায় এবং নব্য-ন্যায় নামক চারটি সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র ধারার। তবে সে যুক্তি অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা থেকে ভিন্ন। কিন্তু, অরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণাণ, সুরেন্দ্রনাথসহ সে সময়কার গবেষকদের লেখায় এখানকার বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তা উপেক্ষিত হয়েছে। উপরন্তু চরিত্র বিবেচনায় ভারতশিল্প আধ্যাত্মিক নয়, আধ্যাত্মিকতা তার অপরাপর বিষয়গুলোর একটি। গুপ্ত যুগের শিল্পকর্মে এবং পরবর্তীসময়ে রাজপুত এবং পাহাড়ি ধারার শিল্পে তখনকার সাধারণ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি যেমন উঠে এসেছে; তেমনি মুঘল চিত্রকলায় উঠে

এসেছে সম্রাটের দরবার, শাসন এবং জীবনযাপনের বিবরণ। হ্যাবেলের পরে কোলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেছিলেন পারসি ব্রাউন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> The painting of the Mogul School exhibits the same technical traits as the Rajput art, but is distinguished by a widely different intention. It strives after no spiritual conceptions, but embodies a genuine statement of fact. Some of the illustrative work deals with the mythical, but the Mogul miniatures are, in the main, material. Religion played no part in the artistic productions of this school. It excelled in portraiture, and in this field it subconsciously went beyond the representation of superficial facts, often recording the innermost character of the sitter in a very spontaneous manner.
>
> [Brown, ১৯১৮: ৮]

যে আধ্যাত্মিকতাকে ভারতের সামান্যচিত্র ভেবেছেন সেই সময়কার দার্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিকগণ তা ধর্মসাপেক্ষ; সে কারণে ১৯৪৭ সালে জন্ম হয় ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রের। সেখানে বাংলাদেশের স্থান হয় পাকিস্তানের সাথে। কিন্তু এই অধ্যাত্মবাদ মানব-মুক্তি ঘটাতে ব্যর্থ, ব্যর্থ স্থায়ী আত্মপরিচয় নির্মাণে। পাশ্চাত্য জ্ঞানকাণ্ডে উপস্থাপিত এবং নির্মিত প্রাচ্যের পরিচয় অত্যন্ত ব্যাপক, যার আওতায় পড়ে বিভিন্ন জাতি-বর্ণের মানুষ। তাদের কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু প্রতিরোধের প্রয়োজনে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে প্রতিষেধায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে 'আধ্যাত্মিক রূপে' নির্মিত হয়েছে সমগ্র প্রাচ্যের আত্মপরিচয়, কিন্তু এই পরিচয় বাংলাদেশের মানুষের নয়, ভারতের নয়, জাপানের নয়, চীনেরও নয়। ফলে এই নির্মিত আত্মপরিচয় মাটি এবং মানুষের সাথে সম্পর্কিত নয় বলে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে আত্মসত্তা থেকে। যাকে 'দ্বি-বিচ্ছেদায়ন' বলা যেতে পারে [বিস্তারিত- ৬.১.৩]।

১৯৭১ সালে সুলতান ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিণতি দেখেছেন এবং সেই সাথে অনুসন্ধান করেছেন এ অঞ্চলের মানুষের চরিত্র, টিকে থাকার শক্তি। তাই, সুলতানের কাছে মনে হয়নি আধ্যাত্মিকতা এ অঞ্চলের মানুষের প্রতিরোধের শক্তি, বরং তার কাছে মনে হয়েছে হাজার বছরের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সংস্কৃতি এ অঞ্চলের মানুষের প্রতিরোধের মূল শক্তি। তাই তার ক্যানভাসের বিষয় গ্রামের প্রান্তিক কৃষকের মহাবয়ান। সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা কেবল তার শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অঙ্কনরীতি এবং উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই চিন্তা লক্ষ করা যায়।

২.২. ভারতশিল্পের অভিমুখিতা

বিশেষ সময়ে কোনো অঞ্চলের শিল্পচর্চার এবং ভাবনার সামান্যচিত্র পাওয়া যায় না, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তার কিছু অভিমুখিতা লক্ষ করা যায়। এই অভিমুখিতা ভবিষ্যতেও থাকবে তা কখনো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। রেনেসাঁ থেকে উনিশ শতকের শেষ অব্দি ইউরোপীয় শিল্পচর্চার সাথে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতশিল্পের অভিমুখিতার পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য হচ্ছে 'নৈর্ব্যক্তিকতা'র ধারণায়নে। হ্যাবেল বলেন, রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপীয় শিল্প 'ম্যেটেরিয়ালিস্ট'[৩]। হ্যাবেল কোন অর্থে 'ম্যেটেরিয়ালিস্ট' বলেছেন তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। ম্যেটেরিয়ালিজমের বাংলা করা হয়ে থাকে 'বস্তুবাদ'। বস্তুবাদ একটি তত্ত্ববিদ্যয়ক প্রস্তাব– যা মনে করে, প্রাণসহ জগৎ উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে বস্তু থেকে, কিন্তু বাস্তববাদ মনে করে জগৎ অস্তিত্বশীল এবং তা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা সম্ভব। এর বিপরীত তত্ত্বানুসারে জগৎ অস্তিত্বশীল নয় এবং তা আমাদের চেতনাজাত। এই তত্ত্ব ভাববাদ নামে পরিচিত। বস্তুবাদ এবং বাস্তববাদ সম্পর্কিত হলেও তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। কেউ বস্তুবাদী না হয়েও বাস্তববাদী হতে পারে। প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ, বস্তুবাদ এবং বাস্তববাদ শব্দের ব্যবহার না থাকলেও এ ধরনের চিন্তার অস্তিত্ব রয়েছে। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে বস্তুবাদ থেকে বাস্তববাদের প্রভাব বেশি। সম্ভবত, হ্যাবেল অসচেতন ভাবে বাস্তববাদ অর্থে 'বস্তুবাদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপরও প্রথাগত অর্থে বস্তুবাদ গ্রহণ করেও বলা যায়, ভারতশিল্প বস্তুবাদী না হলেও বাস্তববাদী। তবে তার পার্থক্য রয়েছে ইউরোপীয় শিল্পচর্চার সাথে। তাই, আমাদের প্রয়োজন শিল্পে বাস্তববাদ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো মনে করতেন, আমাদের জগৎ ভাববিশ্বের (world of idea) মিমেসিস (mimesis) এবং শিল্প সেই মিমেসিসের মিমেসিস। গ্রিক শব্দ 'মিমেসিস'-এর অর্থ হচ্ছে 'অনুকরণ' বা 'নকল'। সে কারণে শিল্প ভাববিশ্ব থেকে দুই ধাপ দূরে। প্লেটোর মতো অ্যারিস্টটল মনে করতেন– শিল্প হচ্ছে জগতের মিমেসিস। অ্যারিস্টটল মিমেসিস শব্দটিকে খানিকটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অ্যারিস্টটল মিমেসিসকে

---

৩ 'The West, surfeited with the materialism of the Renaissance, is already slowly turning again to the East for spiritual instruction. The East, reawakening, is becoming conscious of the truth of her inspiration, and at the same time is learning, from contact with Western civilization, the causes of her own decadence.' [Havell, ১৯২০: ৪১]

কখনো 'প্রক্রিয়া' বা 'কর্ম', কখনোবা 'ফল' অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া, অনুকরণ প্রশ্নে 'মিমেসিস' শব্দটি তিনি দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন। *পোয়েটিক্সের* সংযুক্তিতে এ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল বলেন,

> The good portrait-painter; while they make likenesses by giving the 'true shape. (Of their subject) they also paint them better-looking (more beautiful).
>
> [Aristotle,১৯৯৭: ১০৮]

তার মতে, শিল্প জগৎ অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। মূল গ্রিক সংস্করণে (যদিও তা আরবি অনুবাদ থেকে পুনরায় অনূদিত), অ্যারিস্টটল 'agathoi' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে 'ক্ষমতা রয়েছে'। অর্থাৎ ভাল চিত্রশিল্পীর কোনো বিষয়কে আরো নান্দনিকভাবে উপস্থাপনের ক্ষমতা রয়েছে। তাই, বলা যেতে পারে অ্যারিস্টটল 'মিমেসিস' শব্দটি 'উপস্থাপন' এবং 'প্রতিচ্ছবি' দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ইটালীয় শিল্পী এবং ঐতিহাসিক জর্জিও ভাসারি (১৫১১-১৫৬৪) (যার বিস্তর প্রভাব রয়েছে রেনেসাঁ এবং তার পরবর্তী শিল্পীদের উপর) বলেন, 'These are more noble and perfect in proportion as they approach more neary to the truth.' [Vasari, ১৯১২ [১৫৫৫]: XXIV]। সত্যে পৌঁছাবার যে ব্রত রেনেসাঁ শিল্পীগণ নিয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে প্রতিচ্ছায়ায় পরিণত হয়। রেনেসাঁ-উত্তর ধারাগুলো বিভিন্নভাবে জগতের প্রতিচ্ছায়া অঙ্কন করতে চেয়েছে। ভাসারি মনে করেন শিল্পের মহত্ত্ব নির্ভর করে বাস্তবতা উপস্থাপনের ক্ষমতার উপর। যে শিল্পী যত নিখুঁতভাবে জগতের প্রতিচ্ছবি উপস্থান করেন, তিনি তত বড় শিল্পী। যে মাধ্যম যত নিখুঁতভাবে তা করতে পারে তা তত উন্নত শিল্পমাধ্যম। সে বিবেচনায় ভাস্কর্য চিত্র অপেক্ষা উন্নততর শিল্প।

২.২.১. ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক

নিখুঁতভাবে জগৎকে উপস্থাপন করার জন্য আমাদেরকে ইন্দ্রিয়নির্ভর হতে হয়। হতে হয় দৃষ্টিনির্ভর। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুকে ভিন্ন দেখায়, তেমনি ভিন্ন আলোতে তাকে ভিন্ন দেখায়। তাই বস্তুর যথার্থ নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপন তখনই সম্ভব হবে যখন তাকে নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ আলোতে যে রূপ দেখায় তা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা হবে। তাই, শিল্পের লক্ষ্য বিশেষ দৃষ্টিকোণ নির্ভর বাস্তবতাকে উপস্থাপন। সে কারণে, পাশ্চাত্যের বাস্তববাদী শিল্পে উপস্থাপিত নৈর্ব্যক্তিক জগৎ ব্যক্তিসাপেক্ষ।

পাশ্চাত্যের শিল্পকলায় উপস্থাপিত হয়েছে ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা, যা রেনেসাঁ এবং রেনেসাঁ-উত্তর মূলধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য, যার সরাসরি প্রভাব রয়েছে মেনারিজম, বোরক, রকোকোসহ প্রতিচ্ছায়াবাদ পর্যন্ত।

একটি ভাস্কর্যকে যে কৌশলে বাস্তবের রূপ দেয়া যায়, সে কৌশল চিত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন দ্বিমাত্রিক উপরিতলে ত্রিমাত্রিক চিত্র অঙ্কন করা। দ্বিমাত্রিক উপরিতলে ত্রিমাত্রিক চিত্র অঙ্কনের কৌশলকে বলা হয় পরিপ্রেক্ষিত বলে। ১৪২০ সালে ফিলিপো ব্রুনেলেসকি রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কার করেন এবং লিও বাতিস্তা আলবের্তি ও পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেসকা একে শাস্ত্রে পরিণত করেন। এই পদ্ধতি এতই প্রতাপশালী হয়ে ওঠে যে, পাশ্চাত্যে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করে শিল্প এবং অশিল্প বিবেচনা শুরু হয়। কিন্তু, ভারতে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের ব্যবহার নেই এবং তা আবিষ্কারও হয়নি। আবিষ্কার করার প্রয়োজনও উপলব্ধ হয়নি। তার কারণ ভারতশিল্প বাস্তববাদী হলেও তার নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণা ভিন্ন। সে কারণে ইউরোপ এবং ভারতশিল্পের মূল ধারার অভিমুখিতা ভিন্ন।

২.২.২. ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক

শিল্প বিষয়ক সংস্কৃত সূত্রসাহিত্যের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। এসবের মধ্যে গুপ্ত যুগের প্রথম দিকে রচিত নগ্নজিৎ-এর *চিত্রলক্ষণ* চতুর্থ শতকে বাৎসায়নের *কামসূত্র*, পঞ্চম শতকের *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ* এবং গুপ্ত যুগের শেষের দিকে রচিত বরাহমিহিরের *বৃহৎ সংহিতা* উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে চতুর্দশ শতকে বেদান্ত দার্শনিক মাধবাচার্যের *পঞ্চদশী* সহ বেশ কিছু টীকা এবং ভাষ্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সকল শাস্ত্রে সরাসরি ব্যক্ত করা হয়েছে— শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তবতাকে উপস্থাপন। এই গ্রন্থগুলো সে সময়ে ইংরেজিতে অনুবাদ না হওয়ার কারণে হ্যাবেলের ভারতশিল্পের ইতিহাস অনুসন্ধান অনেকাংশেই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর নির্ভরশীল ছিল। যদিও শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে শিল্পরস উপলব্ধিতে ঝুঁকি আছে, তবে শাস্ত্র শিল্পের প্রেক্ষাপট এবং মহত্ত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করে। একই কারণে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে শিল্পদর্শনের পাঠ বিপথে যাবার আশংকা থাকে। সে কারণে নির্দিষ্ট এলাকার শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং অভিমুখিতা অনুসন্ধানের জন্য খানিকটা হলেও শাস্ত্রনির্ভর হওয়ার প্রয়োজন আছে।

শিল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবতাকে যথার্থভাবে উপস্থাপন, একথা সরাসরি ব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ*-এ চিত্রশিল্পীর গুণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

মহান সেই চিত্রকর, যার তুলিতে ধরা পড়ে।
তরঙ্গ, অগ্নি ও ধোঁয়া বাতাসের গতি অনুসারে।। [৪]

[*বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ*, অধ্যায় ৪৩, সূত্র-২৮]

মাধবাচার্য *পঞ্চদশী*তে চিত্রদীপ অধ্যায়ে চিত্রকলা নিয়ে আলাপ করেন। সেখানে তিনি বলেন,

কি জীব কি জড়
উত্তমাধভাবে সে যাহার যথাস্থান অধিকার করে আছে।
চিত্রপটে সেভাবে বর্তমান।। [৫]

[*পঞ্চদশী*, চিত্রদীপ, শ্লোক-৫]

এ যে শুধু শাস্ত্রের অভিব্যক্তি তা-ই নয়, তা সাধারণ মানুষেরও অভিব্যক্তি। এ সম্পর্কে কালিদাসের *শকুন্তলা* নাটকের ষষ্ঠ সর্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। শকুন্তলার প্রতিকৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে দুষ্মন্ত শিল্পীকে বলেছিলেন, শুধু শকুন্তলার ছবি আঁকলেই হবে না তার পিছনের নদী, গাছপালার প্রতিচ্ছবিও আঁকতে হবে।

> চিত্রপটে যে বিষয় সম্যক চিত্রিত না হয়, চিত্রকরেরা তাহার অন্যথাচরণ করিয়া থাকে। তথাপি প্রিয়তমার লাবণ্য কিঞ্চিত পরিমাণেও এই চিত্রফলকে অঙ্কিত হইয়াছে। এই চিত্রফলক সমতল বটে, কিন্তু তথাপি স্তনদ্বয় উন্নতের ন্যায় এবং নাভিদেশ উচ্চনীচ বলিয়া বোধ হইতেছে, তৈলাক্তবর্ণের শক্তিগুণ হেতু অঙ্গের কোমলতা যেন স্থায়ীরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন প্রিয়তমা বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন এবং মৃদু হাস্য সহকারে আমাকে যেন কী বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। [৬]
>
> [*শকুন্তলম* : ষষ্ঠ সর্গ]

---

[৪] *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ*-এর ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত।

[৫] প্রাণিনোহত্র জেড়া আপি।
উত্তমাধমভাবেন বর্তন্তে পটচিত্রবৎ।। [*পঞ্চদশী*, চিত্রদীপ, শ্লোক: ৫]

[৬] যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদণ্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং লেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম। তথাহি–
অস্যাস্তঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্বেব নাভিঃ স্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্বতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামনি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মাদ্দবমিদং স্নিগ্ধ প্রভাবম্বিরং
প্রেম্না মন্মুখমী যদীক্ষত ইবা স্মেরা চ বক্তীব মাঘ।। [*শকুন্তলম* : ষষ্ঠ সর্গ]

রাজার বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, শকুন্তলার চিত্রটি দুই-তৃতীয়াংশ কৌশলে আঁকা প্রতিকৃতি; কিন্তু দুষ্মন্তের কামনা, শিল্পী যেন শকুন্তলার চারপাশের ছবিও আঁকেন এবং কল্পিত বাস্তবতাকে বাস্তবরূপ দান করেন। দুষ্মন্তকে কোনো জনবিচ্ছিন্ন মানব ভাবা ভুল হবে, বাস্তববাদী শিল্প সাধারণ মানুষের চাহিদাতেও ছিল।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ এবং *পঞ্চদশী*তে শিল্পের যে লক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে, সেই লক্ষ্য ভাসারিও চিহ্নিত করেছেন। তাহলে, প্রশ্ন হল—এ দুই ধারার মধ্যেকার পার্থক্য কোথায়? ইউরোপ এবং ভারতশিল্পে বাস্তবতাকে উপস্থাপনের একই রকম আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, তাদের নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণা ভিন্ন। তা স্পষ্ট হয় শিল্পের ষড়ঙ্গ ধারণা থেকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে যশোধর *জয়মঙ্গলা* শিরোনামে *কামসূত্রের* একটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে তিনি বলেন–

রূপভেদ, প্রমাণ সমূহ, ভাব, লাবণ্য সংযোজন।
সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ ইত্যাদি চিত্রের ষড়ঙ্গ।। [৭]

[*জয়মঙ্গলা*, প্রথম অধিরন, তৃতীয় অধ্যায়]

যশোধর *কামসূত্রর* টীকায় বলেন, শিল্পের ছয়টি অঙ্গ থাকে এবং এই ছয়টি অঙ্গ যথাযথভাবে মিলিত হলেই চিত্র শিল্পে পরিণত হয়। ছয় অঙ্গের প্রথম তিনটি জ্ঞানগত এবং পরবর্তী তিনটি কৌশলগত। এর শুরু হয় এক বস্তুর সাথে অপর বস্তুর রূপগত পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে এটা প্রয়োজনীয় মনে না হলেও ভারতের বেশ কয়েকটি দার্শনিক ধারা মনে করে জগতে অস্তিত্বশীল বস্তুগুলোর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই যশোধর মনে করেন অপরাপর বস্তুর মাঝে রূপগত পার্থক্য চিহ্নায়ণ, বাস্তব জগৎ চিত্রায়ণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এক বস্তুর সাথে অপর বস্তুর পার্থক্য কী? বস্তুর আকার-আকৃতি জানার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় 'প্রমাণ'-এর ওপর। এই প্রমাণই আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়। 'প্রমাণ' এবং 'ভাব' বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা ভারতশিল্পের সাথে ইউরোপীয় শিল্পচর্চার অভিমুখিতার পার্থক্য খুঁজে পেতে পারি। *কামসূত্রের* উপসংহারে বাৎসায়ন বলেছিলেন, তিনি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে *কামসূত্র* রচনা করেছেন।[৮] *মনুস্মৃতি, ন্যায়সূত্র, নাট্যশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র* থেকে তিনি বিভিন্ন সময় উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং গ্রন্থগুলির নামও উল্লেখ করেছেন।

---

[৭] রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম।। [*জয়মঙ্গলা*, প্রথম অধিরন, তৃতীয় অধ্যায়]

[৮] পূর্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপসৃত্য চ।
কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপণ নিবেশিতম।। [*কামসূত্র*]

প্রমাণ এবং ভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা *কামসূত্রে* নেই, কিন্তু *ন্যায়সূত্রে* বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

অক্ষপদ গৌতম আনুমানিক প্রথম শতকে *ন্যায়সূত্র* রচনা করেন। প্রমাণ বিষয়ে *ন্যায়সূত্রে* বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে । প্রমাণ হচ্ছে 'প্রমা' লাভের মাধ্যম। ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে 'প্রমা'। 'প্রমা' হচ্ছে যথার্থ বা অভ্রান্ত জ্ঞান। এই অভ্রান্ত জ্ঞানের মাধ্যম হচ্ছে 'প্রমাণ'*। *ন্যায়সূত্র* অনুসারে যথার্থ প্রমাণ চারটি— ১. প্রত্যক্ষ, ২. অনুমান, ৩. উপমান ও ৪. শব্দ।[৯] যথার্থ প্রমাণ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন ধারাগুলোর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকে, এবং চার্বাকরা শুধু মাত্র প্রত্যক্ষকে সঠিক জ্ঞানের মাধ্যম মনে করে। ন্যায়সূত্র অনুসারে, প্রত্যক্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে— ১. নির্বিকল্পক ২. সবিকল্পক। বস্তু যখন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে আসে তখন স্পর্শ, গন্ধ এবং শব্দের মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে।[১০] দার্শনিক জন লক একেই 'সংবেদন' (Sensation) বলেছেন। দার্শনিক ভাবে যথার্থ না হলেও, সম্ভবত প্রতিচ্ছায়াবাদী শিল্পীগণ নির্বিকল্পক অবস্থায় প্রাপ্ত তথ্যকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। বিশেষ সময়ে আমরা চোখে যে সংবেদন পেয়ে থাকি তারা তা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন, যার কারণে তাদের শিল্পকর্মগুলো আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হয়। নৈয়ায়িকগণ, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে প্রমা মনে করেন না। সেখানে ভুলের সম্ভবনা থাকে। নির্বিকল্পকের পরবর্তী ধাপ সবিকল্পক। এই স্তরে রূপভেদ তৈরি হয় এবং ভাষার মাধ্যমে চিহ্নায়ণ করা হয়। প্রত্যক্ষের এই ধাপ ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গ 'রূপভেদ'। সবিকল্পক স্তরে আমরা দৃশ্যপটে উপস্থিত বস্তুর স্থান, কাল, অবস্থা, গুণ, কর্ম, আকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হই। সবিকল্পকের পরবর্তী স্তরকে গৌতম 'অলৌকিক প্রত্যক্ষ' বলেছেন। গৌতম অলৌকিক শব্দটি অতীন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহার করেননি। অলৌকিক প্রত্যক্ষ অত্যন্ত জটিল এবং বুদ্ধিজাত বলে তা অনেকার্থে

---

৯ প্রত্যাক্ষানুমানোপমানশব্দঃপ্রমাণানি ।। [*ন্যায়সূত্র*, সূত্রঃ ৩]

১০ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নংজ্ঞানমব্যপ দেশ্যমব্যভিচারিব্যবসায়াত্মকংপ্রত্যক্ষম্ ।। [*ন্যায়সূত্র*, সূত্রঃ ৪], বাৎসায়ন উক্ত সূত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

> ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যজ্জ্ঞানংতৎপ্রত্যক্ষম্।
> ন তহীদানীমিদংভবতি আত্মামনসাসংযুজ্যতে, মনইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি।
> নেদং কারণাবধারণমেতাবৎপ্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্টকারণবচনমিতি।
> যৎপ্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিশিষ্টকারণংতদুচ্যতে, যত্তুসমানমনুমানাদিজ্ঞানস্য ন তন্নিবর্ত্ত্যত ইতি।
> মনসস্তর্হীন্দ্রিয়েণসংযোগো বক্তব্যঃ ভিদ্যমানস্য প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য নায়ংভিদ্যত ইতি সমানত্বান্নোক্ত ইতি।।

* শুধুমাত্র ২.২.২ অধ্যায়ে এই অর্থে 'প্রমাণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যক্তিসাপেক্ষ নয়। এই অবস্থায় মানুষ বস্তু সম্পর্কে সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ এবং যোগজ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে। যেমন ধরা যাক, পদ্ম ফুল। নির্বিকল্পক অবস্থায় আমরা পদ্ম ফুলটিকে শুধু দেখি, স্পর্শ এবং গন্ধও পাই। সবিকল্পক অবস্থায় পদ্মের রং, গন্ধ, আকার-আকৃতি ইত্যাদি গুণ চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে আমরা তার রূপভেদ করি। পরবর্তী সময়ে, বিভিন্ন পদ্মের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করে আমরা পদ্মের সামান্য লক্ষণ পাই। এটাই পদ্মের নৈর্ব্যক্তিক এবং সার্বিক রূপ, যা কোনো ব্যক্তিসাপেক্ষ নয়। এখানেই পাশ্চাত্যের শিল্পদর্শনের সাথে এই অঞ্চলের শিল্পদর্শনের পার্থক্যের শুরু। পাশ্চাত্য যেখানে পদ্মের বিশেষ রূপ অর্থাৎ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে, নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ ব্যক্তির দেখা পদ্মকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করতে চায়, সেখানে ভারতশিল্প চায় পদ্মফুলের ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামান্য চিত্র উপস্থাপন করতে। কিন্তু, এই সামান্য লক্ষণের মাঝেই ভারতীয় শিল্পীরা সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না; সে একই সাথে জ্ঞানলক্ষণও উপস্থাপন করতে চায়। পদ্মের সাথে মাটির সম্পর্ক, পানির সম্পর্ক, তার সাথে অপরাপর ফুলের, গাছের, প্রাণীর সম্পর্কসহ তার সাথে শিল্পীর সম্পর্ক, সংস্কৃতির সম্পর্ক ইত্যাদি হচ্ছে জ্ঞানলক্ষণ। এসব কিছু মিলে হয় 'ভাব', যা ভারতশিল্পের তৃতীয় অঙ্গ। এই 'ভাব' বাস্তব জগৎ থেকে আসা, বুদ্ধির মাধ্যমে উপলব্ধ ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা। তাতে লাবণ্য সংযোজন করে সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়। পাশ্চাত্যের রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করে এক বস্তুর সাপেক্ষে অপর বস্তুর দূরত্ব অনুসারে বস্তুর আকৃতি ও রং উপস্থাপন করা যায় কিন্তু তাদের মধ্যে অন্তর্গত সম্পর্ক উপস্থাপন করা যায় না। কবি যেমন এই সম্পর্ক রূপক এবং উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করেন, শিল্পী তেমন এই সম্পর্ক উপস্থাপনের লক্ষ্যে অন্য কোনো বস্তুর সাথে সাদৃশ্যকে বিভিন্ন প্রতীক এবং ভঙ্গি ব্যবহার করে উপস্থাপন করেন। যা হচ্ছে যথাক্রমে চিত্রের সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ। এ অঞ্চলের শিল্প ভাবনানির্ভর হওয়ার কারণে অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্পর্কিত বস্তু ক্যানভাসে স্থান পায় না। প্রতিটি বস্তু একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। রেনেসাঁ-উত্তর ধারা যেমন মেনারিজম, জাদুবাস্তববাদ এবং কবাসিকার সহজাত অঙ্কন ধারা 'সম্পর্ক' উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। মেনারিজম সেক্ষেত্রে প্রতীক এবং অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করলেও জাদুবাস্তববাদ এবং কবাসিকার সহজাত অঙ্কন ধারা জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত রীতি ভেঙে দিয়েছে সম্পর্ক উপস্থাপনের জন্য। শেষোক্ত দুটি ধারাই বিশ শতকের। রেনেসাঁর সময় থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত ইউরোপের মূল ধারার অভিমুখিতা ছিল ব্যক্তিসাপেক্ষে জগতের নৈর্ব্যক্তিক প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করা। সেখানে ভারতশিল্পের অভিমুখিতা ছিল ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক সত্য প্রকাশ।

২.২.৩. প্রস্তাবের প্রমাণ

এই প্রস্তাব মূলধারার শিল্পদর্শন থেকে ভিন্ন, সে জন্য প্রয়োজন দালিলিক প্রমাণের। তার একটি সহজ উপায় হচ্ছে দুটি ধারার একই অভিমুখিতাসম্পন্ন দুটি চিত্রের মধ্যে তুলনা। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তা প্রমাণ তুলনামূলক সহজ, সে কারণে গন্ধরের বৌদ্ধ ভাস্কর্য এবং গ্রিক-রোমান ভাস্কর্যের মাঝে মিল দেখে ঔপনিবেশিক শিল্পবিকাশ তত্ত্বে পরিবর্তন আনা হয়। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে [বিস্তারিত- ৩.৩.২]। চিত্রের ক্ষেত্রে দুই ধারার- ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক অথবা ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক চিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো গেলে তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক চিত্র অঙ্কনের জন্য রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতকৌশল আবিষ্কার করা প্রয়োজন। তা ভারতীয় শিল্পীদের জানা না থাকায় ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক চিত্র পাওয়া যায় না। সেজন্য আমাদের ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক চিত্রের উপর নির্ভর করতে হবে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) শুধু শিল্পীই ছিলেন না, বিজ্ঞান, প্রকৌশলসহ মানববিদ্যার অধিকাংশ শাখায় তার পদচারণা ছিল। এর নজির পাওয়া যায় তার ব্যক্তিগত দিনলিপিতে। তার ব্যক্তিগত দিনলিপির পরিমাণ আনুমানিক তের হাজার পৃষ্ঠা। সেখানে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের ড্রয়িংসহ দৈনন্দিন বাজারের তালিকারও ড্রয়িং তিনি করেছেন। দা ভিঞ্চির অধিকাংশ চিত্রকর্ম জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর হলেও দিনলিপিতে কিছু ড্রয়িং আছে যেগুলো সামান্য চিত্র– বিশেষ কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কন করা হয়নি; সম্ভবত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সামান্য জ্ঞান অভিমুখী বলে। আনুমানিক ১৪৯০ সালের দিকে দা ভিঞ্চি মানবদেহের কিছু ড্রয়িং করেন, দিনলিপির এই অংশকে আজকাল 'দ্যা ক্যানোন অফ দ্যা প্রপরসন' (The Canon of the Proportions) বলা হয়ে থাকে। মানবদেহের আনুপাতিক অঙ্গবিন্যাসের যথার্থ উদাহরণ ভাবা হয় দিনলিপির এই অংশকে। এই অংশ সংরক্ষিত আছে ইতালিতে এবং মাঝে মাঝে প্রদর্শিত হয় বিভিন্ন দেশে। ভিঞ্চি তার দিনলিপি উল্টো করে লিখেছেন, যা সহজে পাঠযোগ্য নয়। গবেষকরা পরবর্তী সময়ে পাঠোদ্ধার করে দেখেছেন, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের রোমান স্থপতি এবং প্রকৌশলী মারকুস ভিট্রুভিয়াস পলিও-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *দে আর্কিটেকটুরা* (*De Architectura*)-তে মানবদেহের আনুপাতিক আকার নিয়ে আলোচনার উল্লেখ রয়েছে। দা ভিঞ্চি দিনলিপিতে এ বিষয়ে লিখেছেন, 'Le proporzioni del corpo umano secondo

Vitruvio' যার অর্থ হচ্ছে- ভিট্রুভিয়াস অনুসারে মানবদেহের আনুপাতিক আকার। তাই বর্তমানে দা ভিঞ্চির ড্রয়িং-এর নামকরণ করা হয়েছে ভিট্রুভিয়ান ম্যান' (Vitruvian Man)।

দা ভিঞ্চির মানবদেহের এই ড্রয়িং কোনো সাধারণ চিত্র নয়। ভিট্রুভিয়াসের *দে আর্কিটেকটুরা* গ্রন্থে মানবদেহের যে আনুপাতিক আকারের উল্লেখ আছে তার উপর ভিত্তি করে তিনি ড্রয়িং করেছেন। ভিট্রুভিয়াস মনে করতেন, মানবদেহের দৈর্ঘ্য ২৪ করতল এবং এক করতল হচ্ছে ৪ আঙুল। এ সম্পর্কে তিনি *আর্কিটেকটুরার* তৃতীয় গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেন–

> For the human body is so designed by nature that the face, from the chin to the top of the forehead and the lowest roots of the hair, is a tenth part of the whole height; the open hand from the wrist to the tip of the middle finger is just the same; the head from the chin to the crown is an eighth, and with the neck and shoulder from the top of the breast to the lowest roots of the hair is a sixth; from the middle of the breast to the summit of the crown is a fourth. If we take the height of the face itself, the distance from the bottom of the chin to the under side of the nostrils is one third of it; the nose from the under side of the nostrils to a line between the eyebrows is the same; from there to the lowest roots of the hair is also a third, comprising the forehead. The length of the foot is one sixth of the height of the body; of the forearm, one fourth; and the breadth of the breast is also one fourth.
>
> [Vitruvius, ১৯১৪: ৭৩]

ভিট্রুভিয়াসের দেহের আনুপাতিক অধ্যয়ন শুধুমাত্র মাপজোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার দেহভাবনা জগৎতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। গ্রিকদের কাছে জ্যামিতিক আকার, যেমন— বৃত্ত, চতুর্ভুজ এবং ত্রিভুজ অত্যন্ত পবিত্র এবং গূঢ়। যা মহাবিশ্বের মূল আকার। সে কারণে গ্রিকরা পৃথিবীকে গোলাকার থালা এবং মহাবিশ্বকে গোলাকার ভাবত। এই গোলাকৃতিই হচ্ছে যথার্থ বৃত্ত, যার কেন্দ্র থেকে চার পাশের পরিধি সমান। সে কারণে মানবদেহেও যথার্থ বৃত্ত বর্তমান রয়েছে বলে ভাবা হতো। বৃত্ত এবং

চতুর্ভুজকে ভারতবর্ষেও গুরুত্বপূর্ণ আকৃতি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, ভারতবর্ষে বৃত্তের মধ্যে দেহকে মুড়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিল না, যা পাশ্চাত্যে লক্ষ্য করা যায়। দা ভিঞ্চি বুঝতে পেরেছিলেন হাত সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকলে এবং তাকে কেন্দ্র করে চতুর্ভুজ আঁকলে, আর সেই কেন্দ্রকে ভিত্তি করে বৃত্ত আঁকলে মানুষের হাত বাহিরে চলে যায়, তাই তিনি একই দেহের উপর হাত-পা কে বৃত্তের পরিধির উপর পুনঃবিন্যস্ত করে আরেকটি মানবদেহ আঁকেন, যার হাত-পা বৃত্তের পরিধির মাঝে রয়েছে এবং একই সাথে ভিট্রভিয়াসের দেহানুপাত যথার্থভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই চিত্র ইউরোপীয় তত্ত্ববিদ্যায় তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা ইউরোপীয় ভাবনা জগতের ঐতিহাসিক সমস্যার অসাধারণ সমাধান। আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানে এই ড্রয়িং-এর তাৎপর্য ভিন্ন। ভিট্রভিয়াস মানবদেহের যে আনুপাতিক পরিমাপ দিয়েছিলেন তা মানবদেহের সামান্য চিত্রের উদাহরণ যা জগৎ থেকে উদ্ভূত এবং জগতেরই উপস্থাপন। দা ভিঞ্চি ভিট্রভিয়াসের মাপজোকের উপর ভিত্তি করে ড্রয়িংটি অঙ্কন করেছেন, যাকে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে মানবদেহের ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক ড্রয়িং এবং তা বিশেষ ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি নয়, বরং মানবদেহের সামান্য চিত্র।
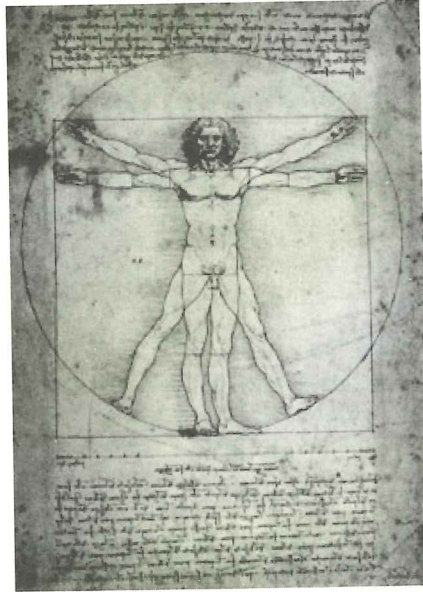
চিত্র-১ ভিট্রভিয়ান ম্যান

ভারতশিল্পের মূলধারায় দেহ অঙ্কনের ভিত্তি হচ্ছে 'উত্তম নবতাল'। তা শুধু মানুষের দেহ অঙ্কনের ভিত্তি নয়, বৈদিক দেব-দেবী এবং বৈদিক সাহিত্যে যাদের অসুর বলা হয়েছে তাদেরও ভাস্কর্য নির্মাণ এবং চিত্র অঙ্কন করা হয় উত্তম নবতাল অনুসরণ করে। *চিত্রলক্ষণ*, *বিষ্ণুধর্মোত্তর*, *বৃহৎ সংহিতা*সহ পরবর্তীকালের সূত্রসাহিত্যে নবতালের আলোচনা দেখা যায়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে নবতাল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। নবতাল অর্থ হচ্ছে নয় তাল অর্থাৎ উত্তম বা আদর্শ দেহ নয় তাল হয়ে থাকে। নয় তালে ১০৮ আঙুল হয়। আদর্শ দেহের দৈর্ঘ্য ১০৮ আঙুল ধরে অপরাপর অঙ্গের আনুপাতিক আকার উল্লেখ করা হয়েছে। আঙুলের আকার নির্ভর করে ব্যক্তির আকরের ওপর। সে কারণে শিল্পশাস্ত্রে পরম এবং সাপেক্ষ দুই ধরনের মাপ দেখা যায়। পরম পরিমাপের ক্ষেত্রে এক আঙুলের সমান আট যব নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এতে করে, আদর্শ দেহের আনুপাতিক আকারের কোনো পার্থক্য হয় না। চিত্র নং-২ *বিষ্ণুধর্মোত্তরের* উপর নির্ভর করে অঙ্কন করা হয়েছে, যেখানে দেহের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১০৮ আঙুল। আঙুলসহ হাতের দৈর্ঘ্য ৪৬ আঙুল। পায়ের পাতা একতাল এবং মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থও একতাল। [বিস্তারিত- পরিশিষ্ট- ১]।

উত্তম নবতালে পূর্ণাঙ্গ দেহের দৈর্ঘ্য ১০৮ আঙুল এবং দুই হাত লম্বা করে রাখলে ১০৮ আঙুল হয়। সম্পূর্ণ দেহের চারপাশ দিয়ে রেখা টেনে আমরা একটি গ, ঘ, ঙ এবং চ চতুর্ভুজ পাই। তার মাঝ বরাবর দুটি সরল রেখা, যথাক্রমে ক, ক´এবং খ, খ´ অঙ্কন করে দুই রেখার ছেদবিন্দুকে কেন্দ্র ধরে বৃত্ত অঙ্কন করি। যার একপাশের পরিধি পা এবং অপর পাশের পরিধি মাথাকে ছেদ করে। এই দেহ ভিট্রুভিয়াসের আদর্শ মানবদেহের ড্রয়িং নয়, কারণ তাতে বৃত্তের কেন্দ্র মানবদেহের নাভি নয় এবং তা কব্জিকে ছেদ করেছে।

কিন্তু, আমরা যদি, দা ভিঞ্চির 'ভিট্রুভিয়ান ম্যান' ড্রয়িং-এ ফিরে যাই এবং পূর্বের মতো ভিট্রুভিয়ান ম্যান-এ অঙ্কিত চতুর্ভুজকে গ, ঘ, ঙ এবং চ চার কোণে চিহ্নিত করি; তার ঠিক মাঝ বরাবর ক, ক´এবং খ, খ´রেখা টেনে চতুর্ভুজকে চার ভাগে ভাগ করি এবং ছেদ বিন্দুকে কেন্দ্র করে বৃত্ত অঙ্কন করি যার এক পরিধিতে পা এবং অপর পরিধিতে মাথা রয়েছে, তাহলে আমরা লক্ষ করব বৃত্তের পরিধি হাতের কব্জিকে ছেদ করে যাচ্ছে। তার অর্থ হলো দুটি ছবিতে অঙ্কিত দেহের আনুপাতিক আকার একই। আপাতত অপরাপর বিষয় বিবেচনায় না গিয়ে বলা যেতে পারে দুটি ধারাই বাস্তবতাকে উপস্থাপন করছে, একটি ব্যক্তিসাপেক্ষ এবং অপরটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক রূপে।

চিত্র-২ উত্তম নবতাল (পূর্ণাঙ্গ দেহ)
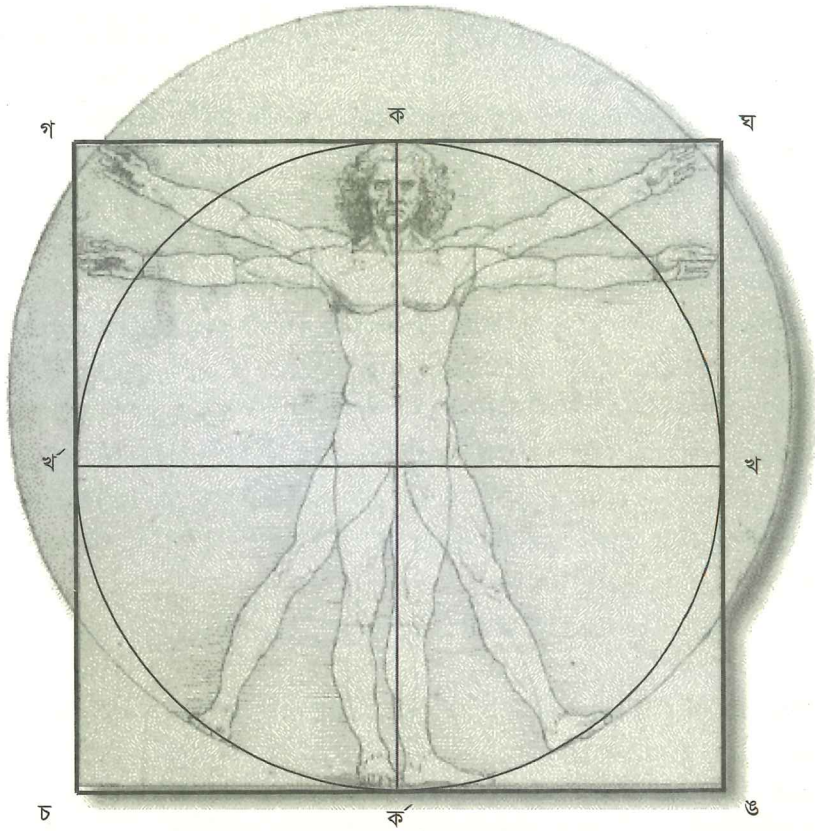
চিত্র-৩ ভিট্রুভিয়ান ম্যান

রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপীয় শিল্পচর্চা যদি বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের ব্রত না নিয়ে জগতের সামান্য চিত্র অঙ্কন করত তা হলে তা ভারতের মূল ধারা থেকে ভিন্ন হতো না।

যদিও একই চিত্রে বিভিন্ন আকারের মানুষের উপস্থাপন আমরা দেখতে পাই অজন্তার দেয়াল-চিত্রে। কিন্তু তাদের আনুপাতিক আকার একই। এক ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান এবং গুরুত্বসহ অপরাপর ভাবনা প্রকাশের জন্য এই কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের অঙ্কন-কৌশলের ভিত্তি বাস্তবতার সামান্য আকার। হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট্য যথার্থভাবে চিহ্নিত করেননি। 'আধ্যাত্মিকতা' ভারতশিল্পের একটি বিষয়, বৈশিষ্ট্য নয়। তবে, ভারতশিল্পের বহুল চর্চিত বিষয় হচ্ছে 'আধ্যাত্মিকতা', যেমনটা ছিল সাধারণ মানুষের জীবন, সম্রাটদের দরবার এবং জীবন, এমনকি যৌনজীবনও। সে কারণে হ্যাবেল খাজুরাহো-এর টেরাকোটা, মুঘল চিত্রে অঙ্কিত সম্রাটের দরবার ও জীবন, পাহাড়ি এবং রাজপুত চিত্রে অঙ্কিত সাধারণ মানুষের জীবন সংবলিত চিত্রকে নিম্নমানের শিল্প মনে করেছেন। তাছাড়া আমাদের একই সাথে স্মরণ রাখা উচিত বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত প্রতিমা যার সবগুলো শিল্প নয়। কিন্তু, সব প্রতিমার ভিত্তি উত্তম নবতাল, অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর ভিত্তিও মানব দেহের সামান্য আকার।

কিন্তু, ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয় চিত্রকে ART এবং ভারতীয় চিত্রকে CRAFT চিহ্নিত করা হলো এবং প্রথমোক্তকে আধুনিক, অপরটিকে অনাধুনিক। হাজার হাজার বছর ধরে চর্চিত শিল্প পরিণত হলো CRAFT-এ। পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা এবং বৈষয়িকতার কারণে এ অঞ্চলের শিল্পচর্চার অভিমুখিতা পরিবর্তিত হয়।

সুলতানের শিল্পকর্মে ভারতশিল্পের অভিমুখিতা বর্তমান। সুলতান আমাদের চিন্তা ও শিল্পচর্চায় ঔপনিবেশিকতার ছাপগুলি খুঁজে বের করেছেন, যা বিউনিবেশায়নের প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু তিনি বিউপনিবেশায়নের নামে প্রাক-ঔপনিবেশিক দেশজ শিল্পধারায় ফিরে যাননি; বরং দেশজ শিল্পচেতনার বৈশ্বিক রূপ দান করেছেন। হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পের বিউপনিবেশায়নের প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু, সুলতানের

বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব বঙ্গীয় পুনর্জাগরণবাদ থেকেও অনন্য। হ্যাবেল, কুমারস্বামী বা অবনীন্দ্রনাথ ভেবেছেন ভারতশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য 'আধ্যাত্মিকতা'। আত্মপরিচয় নির্মাণের এই রাজনীতিকে বলা যেতে পারে 'দ্বি-বিচ্ছেদায়ন'। সুলতানের শিল্পকলায় বি-বিচ্ছেদায়নের প্রস্তাব রয়েছে। একই সাথে তার শিল্পকর্মে রয়েছে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিবয়ান। কিন্তু সুলতানের এই প্রয়াস শিল্পসমালোচকদের অবোধগম্যতা ও বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় কোনো ধারাকে প্রভাবিত করতে না পারার ব্যর্থতার জ্ঞানতাত্ত্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সে সাপেক্ষে সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা পর্যালোচনা করা জরুরি। আর তা করার জন্য আমাদের প্রয়োজন ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত পাঠ। তাই, পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ভারতশিল্পে উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া ।

৩

ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন

History is always ambiguous. Facts are hard to establish, and capable of being given many meanings. Reality is built on prejudices, misconceptions and ignorance as well as on our perceptiveness and knowledge.

SALMAN RUSHDIE

ইংরেজ শাসনামলের দুইশত বছর এবং উপনিবেশোত্তর কালে বৈশ্বিকতার নামে হাজির হওয়া আমেরিকান নব্য-সাম্রাজ্যবাদকে উপেক্ষা করে এখানকার রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য এমনকি শিল্পচর্চার প্রবণতা এবং বাস্তবতা বোঝা সম্ভব নয়। ইংরেজ শাসনামলে শিল্প-সাহিত্যসহ আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় যে প্রভাব পড়েছে তা এখনও সক্রিয়। পাশ্চাত্যের চিন্তার ক্ষেত্রভূমি থেকে আমরা এখনও বের হয়ে আসতে পারিনি। তাই সুলতানসহ বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিনিধিত্বশীল শিল্পীর কাজের প্রবণতা এবং শিল্পচৈতন্য পাঠের জন্য প্রয়োজন বিগত আড়াইশ বছরের শিল্পসূত্রগুলো চিহ্নিত করা।

৩.১. কেমন উপনিবেশায়ন

সাধারণত উপনিবেশ বলতে আমরা বুঝি কোনো জাতিগোষ্ঠীর অন্য কোনো রাষ্ট্র অথবা জাতিগোষ্ঠীর উপর সরাসরি সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে ভূমি এবং অন্যান্য সম্পদসমূহ সার্বিক অধিগ্রহণ করা। এ প্রক্রিয়াকে উপনিবেশায়ন বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ষোড়শ শতকের পর ইউরোপীয়দের হাতেই প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে এর পূর্বেও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে রোমানদের আটলান্টিক থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন এবং চেঙ্গিস খান ও তার বংশধরদের চীন থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত দখল। ষোড়শ শতকের পূর্ব পর্যন্ত সকল উপনিবেশের কোনো সামান্য বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া কঠিন, তাদের মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু ষোড়শ শতক-উত্তর ইউরোপীয় উপনিবেশের চরিত্র পূর্ববর্তী যে কোনো উপনিবেশ থেকে ভিন্ন। এটি সুস্পষ্ট হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর সংস্কৃতি, ভাষা এবং রাজনীতি বিশ্লেষণ করলে। ও. মেননি (১৯৫০), এইমে সেজায়ার (১৯৫৫), আলবেয়ার মেমি (১৯৫৭), ফ্রাঁৎস ফানো (১৯৬১), এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৭৮) প্রমুখ উপনিবেশকালীন এবং উপনিবেশোত্তরপর্বে ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশিতের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনায় বিতর্কও রয়েছে। ও. মেননি ১৯৫০ সালে প্রকাশিত *Psychologie de la colonisation* বইয়ে ষোড়শ শতকে উত্তর ইউরোপীয় উপনিবেশের নতুন এক চরিত্র ইঙ্গিত করেন যা স্পষ্ট হয় পরবর্তী দুই দশকে। ইউরোপের বড় সংখ্যক তাত্ত্বিক এবং গবেষকদের কাছে উপনিবেশায়ন পাঠ সীমাবদ্ধ ছিল ভূমি অধিগ্রহণ, সম্পদের লুণ্ঠ, শারীরিক নির্যাতন এবং নিপীড়নে। সে কারণে ভাবা হয় উপনিবেশকদের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হবে

উপনিবেশায়নের। সমাপ্তি হবে এই কালো অধ্যায়ের। একই ভাবনা ছিল উপনিবেশিত গোষ্ঠীর নেতৃবর্গেরও। সে কারণে তাদের জন্য সামরিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য যদিও তা অর্জনের স্বার্থে আন্দোলনের ধারায় ভিন্নতা ছিল। কিন্তু ও. মেননি, মেমি ও ফানো তত্ত্বীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন যে, প্রত্যক্ষ উপনিবেশের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাদের মতে, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রগুলোর উপর মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশবাদ এখনো জারি আছে। মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশের দুটি পর্যায় থাকে– ১. ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণপ্রকল্প; যেখানে উপনিবেশিতের ইতিহাস ও বাস্তবতার বয়ান থাকে, যাতে সত্য থেকে সত্যভ্রম থাকে বেশি, ২. সেই জ্ঞানকাণ্ড প্রসার ও প্রচারের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিতের চৈতন্যে আধিপত্য বিস্তার। যার ফলে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী যেমন আত্মবিশ্বাস হারায় তেমনি হয়ে ওঠে অনুকরণপ্রবণ। ভারতীয় শিল্পকলা মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের শিকার হয়েছে এবং তা উল্লিখিত দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে। কয়েক হাজার বছরে বিকশিত ভারতীয় শিল্পকলা, যার নিজস্ব অঙ্কনরীতি এবং বিষয়বস্তু আছে তা উনিশ শতকের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণায় ধরা পড়ল 'CRAFT' হিসেবে। তাদের বিবেচনায় ভারতে চর্চিত শিল্প, ইউরোপীয় 'FINE ART'-এর সমকক্ষ নয় এবং এর ধারাবাহিক কোনো চর্চার ইতিহাস নেই, যা ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাস ও বাস্তবতার আংশিক সত্য বা সত্যভ্রম। এই সত্যভ্রমই ভিত্তি প্রদান করে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পী ও শিল্পরসিকসহ অন্যদের চৈতন্যে আধিপত্য বিস্তারের। ফলে পশ্চিমা এবং ভারতীয়দের চোখে এ দেশের শিল্পকর্ম অবমূল্যায়িত হয়েছে, আর ঠিক সে কারণেই যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক হয়ে পড়ে ইউরোপীয় শিল্পচর্চা। যা একই সাথে নিজস্ব ঐতিহ্য এবং অঙ্কনরীতি থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। কিন্তু এই বিজাতীয়করণ প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে বাংলা অঞ্চলের শাসনকার্য কোম্পানির হাতে যাওয়ার সাথে।

৩.২. কেন উপনিবেশায়ন

১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার উপনিবেশায়ন শুরু হয়নি। ১৭৬৫ সালে মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পায়। এই রাজস্ব আদায়ের অধিকারের মধ্য দিয়ে উপনিবেশের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আইনি বৈধতা পায় উপনিবেশের সর্বোচ্চ হাতিয়ার- বল প্রয়োগ এবং ভূমি নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে উৎপাদনকে প্রভাবিত করা। তা ছাড়া সকল প্রকার প্রত্যক্ষ উপনিবেশের চরিত্র তখন থেকে প্রকাশ পেতে থাকে [রণজিৎ, ১৯৮৮: ৪]। পরে

যার উপর ভিত্তি করে মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের সূত্রপাত হয়, এবং এর প্রভাব পড়ে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন, শিল্পসাহিত্যসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ভারতীয় শিল্পকলাবিষয়ক গবেষণা আঠারো শতকের শেষের দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অধ্যয়ন করতে গিয়ে শুরু হয়। এই আগ্রহের দুটি কারণ ছিল– ১. শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বাঙালিসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, ২. আঠারো এবং উনিশ শতক থেকে প্রত্ননিদর্শনের (antiquities) বাজারমূল্য বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসারদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। ফলে ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। তবে তা কেবল মানচিত্র তৈরি এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি এবং মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নেরও প্রয়োজন ছিল। সে কারণে শুরু হয় এই অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন ও ধর্মের অধ্যয়ন। এই অধ্যয়নকে কখনো চিহ্নিত করা হয়েছে 'ভারতবিদ্যা', কখনোবা 'প্রাচ্যবিদ্যা' বলে। এই ভারতবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হেস্টিংস বলেন, 'Every accumulation of knowledge and specially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state.' [উদ্ধৃত হয়েছে– Stokes, ১৯৫৯: ৩৫-৬]

সে কারণে কোম্পানির অর্থ সহযোগিতায় উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'। ঔপনিবেশিক যুগে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মজবুত করতে এশিয়াটিক সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সোসাইটি আঠারো শতকে বিপুল পরিমাণ গবেষণা বই প্রকাশ করে। সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি বইসমূহ ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। একই সাথে সোসাইটি এখানকার মানচিত্র তৈরি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনা করে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের অংশ হিসাবে আমাদের প্রাচীন শিল্পকলা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। যার অনেকাংশই শাসনকার্যে সহায়তা করেছে বলে গবেষকরা মনে করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যয়ন শুধুমাত্র শাসন ও শোষণকার্য পচিালনার জন্য নয়। তার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। সোনা, রুপা, দামি পাথরের সাথে প্রত্ননিদর্শন লুট করে ইউরোপে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই অনুসন্ধান চালানো হতো। এই লুট শুধুমাত্র ভারতবর্ষে হয়েছে তা নয়, তা একাধারে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য এবং ল্যাটিন আমেরিকায়ও ঘটেছে। কী

পরিমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন লুট করে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার বয়ান পাওয়া যায় ঐতিহাসিক উইলিয়াম ডালরিম্পিল-এর সদ্যপ্রকাশিত গার্ডিয়ান সংবাদপত্রের একটি নিবন্ধ থেকে–

> Powis (Castle) is simply awash with loot from India, room after room of imperial plunder, extracted by the East India Company in the 18th century.There are more Mughal artefacts stacked in this private house in the Welsh countryside than are on display at any one place in India even the National Museum in Delhi.
>
> [Dalrymple, ২০১৫]

'প্রত্ননিদর্শন' সাধারণত নির্দেশ করে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অংশবিশেষ, সূত্রসাহিত্য, ভাস্কর্য, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন চিত্রকলা ইত্যাদি। যা কিছু ইউরোপে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল তা বাদে যা কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না তা পড়ে থাকতো অবহেলায়। এরই বর্ণনা পাওয়া যায় কর্নেল আলেকজান্ডার কানিংহামের লেখা চিঠি থেকে–

> During the one hundred years of British dominion in India, the Government had done little or nothing towards the preservation of its ancient monuments, which, in the total absence of any written history, form the only reliable source of information as to the early condition of the country .... Some of these monuments .... are daily suffering from the effects of time, and must soon disappear altogether, unless preserved by the accurate drawings and faithful descriptions of the archaeologist.
>
> [উদ্ধৃত হয়েছে– Guha-Thakurata, ২০০৪: ৩]

প্রত্ননিদর্শনগুলোর অধ্যয়ন প্রয়োজন ছিল এই লুট করা সম্পদের মূল্য নির্ধারণের জন্য। আঠারো এবং উনিশ শতকে উপনিবেশের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ এবং তা পুনঃবিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত লগ্নির কারণে বিপুল অর্থভাণ্ডার তৈরি হয় ইউরোপে। এই অর্থ তখন বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হতো। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত ছিল প্রত্ননিদর্শন ক্রয়। এই সকল প্রত্ননিদর্শনের মূল্য নির্ধারিত হতো তার প্রাচীনতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে। সে কারণে প্রত্ননিদর্শন অধ্যয়নে পুঁজিবাজারের তাগাদাও ছিল। ফলে পরবর্তী একশ বছরে 'প্রত্ননিদর্শন অধ্যয়ন' প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানকাণ্ডে পরিণত হয়, যা থেকে পরবর্তীকালে জন্ম হয় কয়েকটি জ্ঞানকাণ্ডের, যার মধ্যে অন্যতম হলো প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্যকলা এবং ইতিহাস।

৩.৩. ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে ভারতশিল্প

ভারতে শিল্পচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও সেই ইতিহাসের উপর কোনো গ্রন্থ ছিল না। ফলে প্রত্ননিদর্শন অধ্যয়নই প্রথম ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাস নির্মাণ করে। সেই ইতিহাস প্রাচ্যবাদ, উপনিবেশের রাজনীতি এবং পুঁজির প্রভাবের বাইরে ছিল না। তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় উইলিয়াম জোন্স-এর ভারতীয় শিল্পকলার মূল্যায়ন থেকে। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্প নয় বরং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মাত্র। তার মতে, প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের সাথে আফ্রিকার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মিল রয়েছে। তিনি বলেন,

> The remain of architecture and sculpture in India, which I mention here as mere monuments of antiquity, not as specimens of ancient art, seem to prove an early connection between this country and Africa.
>
> [Jones, ১৭৯৯: ৭]

ঔপনিবেশিক আমলে দর্শন, সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞানের মতো শিল্পকলাবিষয়ক ইউরোপীয়দের ভাবনা ভিন্ন ছিল না। তাদের মতে, ভারতে শিল্পচর্চার কোনো ইতিহাস নেই। মিশর, গ্রিক এবং ব্যাবিলনের মতো ভারতীয় চিত্রকলা, ভাস্কর্য জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ, যা বস্তুগত সংস্কৃতি অধ্যয়নে সহায়ক কিন্তু তার কোনো শিল্পমূল্য নেই। সে কারণে তার স্থান একমাত্র জাদুঘরে। আমেরিকান শিল্পরসিক হল্যান্ড কোটার, নন্দলাল বসুকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

> From the official British perspective, India had no living art. Its indigenous traditions were dead, the stuff of museums, and ethnological ones at that. Western classicism was the only classicism; European oil painting was the only worthy medium.
>
> [Cotter, ২০০৮]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারাবাহিক শিল্পচর্চার ইতিহাস থাকলেও সেই ইতিহাস গ্রন্থিত হয়নি। যদিও শিল্পবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, যেমন *চিত্রলক্ষণ*, *কামসূত্র* এবং *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে* শিল্পতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও কোনো ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়নি। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে আঠারো শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের শিল্পচর্চার ইতিহাস অধ্যয়ন শুরু হয়। জেমস

ফার্গুসন (১৮১৮-১৮৮৬) এবং আলেকজান্ডার কানিংহাম (১৮১৪-১৮৭৩) এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের প্রত্ননিদর্শন অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ভারতশিল্পের ইতিহাস নির্মাণ শুরু হয়। তাদের ভারতশিল্পের আলোচনা তুলনামূলক ইতিহাস, অর্থতত্ত্ব, ধর্মভিত্তিক শ্রেণিকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফার্গুসন এবং কানিংহামের ভারতশিল্পকলার ইতিহাসপাঠ শুধুমাত্র যে অপরিপক্ব এবং আঞ্চলিক তথ্য-উপাত্তের সাথেই বিযুক্ত ছিল তা নয়, ধারাবাহিক শিল্পচর্চার যে ঐতিহ্য ভারতে ছিল তা থেকে বিযুক্তিকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের কাজের মধ্য দিয়ে ভারতশিল্প প্রথম পর্যায়ের উপনিবেশায়নের শিকার হয়। সে কারণে তাদের কাজের পাঠ ছাড়া ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া অর্থপূর্ণভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয় এবং বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা আবশ্যক।

কানিংহাম পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ব্যক্তিগত আগ্রহেই ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি জোন্সের মতো মনে করতেন, ভারতে কোনো শিল্পচর্চার ইতিহাস নেই এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন ও ধর্মীয় কারণে এখানকার মানুষ বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ তৈরি করেছে। ফলে ধর্মভিত্তিক শ্রেণিকরণ তার কাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি মনে করতেন, এই সব কারুকাজ– যথাক্রমে ভাস্কর্য, দেয়ালচিত্র ও স্থাপত্যকলার সাথে অধিবিদ্যার গভীর প্রভাব বিদ্যমান এবং তা ব্যাখ্যা করার মূলসূত্র হওয়া উচিত ধর্ম। তার এই ধর্মনির্ভর ব্যাখ্যা করার প্রবণতার কারণ হতে পারে বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বইয়ের সঙ্গে তার পরিচিতি। তিনি তার উপর ভিত্তি করে বটগায়া, বরহুটসহ বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করেন। তার কাজ অনেক বেশি সার্ভে, পরিমাপ এবং সংরক্ষণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনিই প্রথম ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের পরিচালক পদে আসীন হন। তার কাজের মধ্যে পরবর্তীকালে লুট হয়ে-যাওয়া এবং অবহেলায় ধ্বংস হয়ে-যাওয়া প্রাচীন ভারতীয় নিদর্শনগুলোর তথ্য পাওয়া যায় যা বর্তমানে ভারতশিল্পের ইতিহাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু তার ভারতশিল্প পাঠে এখানকার নন্দনতত্ত্ব, সংস্কৃত সূত্রসাহিত্য একদমই প্রাধান্য পায়নি।

ফার্গুসন ভারতশিল্পের একটি তুলনামূলক পাঠ উপস্থাপন করেন। সে কারণে তার ভারতশিল্পের ইতিহাস নির্মাণে তৎকালীন দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব– বিবর্তনবাদ এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রভাব অত্যন্ত লক্ষণীয়। মানব সভ্যতার বিকাশ এবং শিল্পের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জোন্স এবং কানিংহাম থেকে তার অবস্থান ভিন্ন ছিল।

তিনি মনে করতেন— প্রাচীন গ্রিস, মিশর এবং ভারতের স্থাপত্যকলা মৌলিক এবং রেনেসাঁ-উত্তর শিল্পচর্চা গ্রিক এবং রোমান শিল্পের অনুকরণ মাত্র। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পকলা রেনেসাঁ-উত্তরকালে অনুকরণ প্রবণতাকে ছাড়িয়ে গেছে। সে কারণে তা ভারতসহ প্রাচীন সকল শিল্প থেকে উন্নত। উন্নত শিল্পকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য বাস্তবতাকে উপস্থাপন করার ক্ষমতা । ভারতশিল্পে 'Lack of realism or naturalism' [Parul, ২০০৬: ৪]-এর কারণে তা অনুন্নত। সর্বোপরি সময়ের সাথে সাথে তার অবনতি হচ্ছে। সে সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভারতশিল্পচর্চাকে তিনটি পর্বে ভাগ করেন– বৌদ্ধ যুগ, ব্রাহ্মণ যুগ এবং মুঘল যুগ। তাদের মতে, ভারতে সবচেয়ে অধিক বিকশিত পর্ব হচ্ছে বৌদ্ধ যুগ। কারণ গ্রিক ভাস্কর্যের সাথে গান্ধারের বৌদ্ধ মূর্তির মিল পাওয়া যায়। তাই প্রাচীন বৌদ্ধ ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যকলা তুলনামূলকভাবে বিকশিত। পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও মোঘল আমলে তার অবনতি হয়েছে মাত্র। তিনি আরো মনে করতেন, ভারতশিল্পের বিকাশ হয়েছে আর্যদের আগমনের পরে এবং তাদের মাধ্যমে। ভারতে আর্যদের আগমন এবং তাদের প্রভাব তৎকালীন বুদ্ধিভিত্তিক তৎপরতায় বিশেষ প্রভাব ফেলে, বিশেষত ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে। তাই, ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া পাঠের জন্য প্রয়োজন শিল্পকলার বিবর্তন তত্ত্ব ও আর্যতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ।

৩.৩.১. শিল্পকলার বিবর্তন তত্ত্ব

ইটালীয় শিল্পী এবং ঐতিহাসিক জর্জিও ভাসারি (১৫১১-১৫৬৪) এবং জার্মান ধ্রুপদী বিশেষজ্ঞ ও প্রত্নতত্ত্বের জনক যোহান জোয়াকিম ভিকেলমানের (১৭১৭-১৭৬৪) কাজে শিল্পকলার বিবর্তন ধারণার আভাস পাওয়া যায় যা পরবর্তীসময়ে শিল্পকলার বিবর্তন তত্ত্বে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ্য, ভিকেলমানের ইতিহাস পাঠ ও পদ্ধতির প্রভাব পড়ে সে সময়কার নব্য-ধ্রুপদীবাদী শিল্পী ও চিন্তকদের মাঝে। এই চিন্তকদের অন্যতম হলেন ইমানুয়েল কান্ট, জর্জ উইলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল, ফ্রিডরিখ নিটশে।

ভাসারি ছিলেন মিকেলাঞ্জেলোর সমসাময়িক। তিনি শিল্পকলার ইতিহাসের বিষয়ে দুটি বই রচনা করেন– *লে ভিতে দে' পিও অর্চেলিয়েনতে পিটরি, স্কালটরি ই আর্কিটেকটরি (Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori)* এবং *রাগীয়নামেন্তি সপ্রা লে (Ragionamenti sopra le)*। *লে ভিতে দে' পিও* ১৫৫৫ সালে এবং *রাগীয়নামেন্তি* প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর। ভাসারি তার *লে ভিতে দে'*

পিও বইতে শিল্পকলার ইতিহাসকে তিন কালে ভাগ করেন— ১. প্রাচীন যুগ ২. মধ্যযুগ এবং ৩. রেনেসাঁ যুগ। গ্রিক এবং রোমান আমল হলো প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠতম সময়, যখন শিল্পচর্চা কৌশল ও নন্দন বিবেচনায় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল, কিন্তু তার অবনতি হয় তৎপরবর্তীকালে বাইজেনটাইন এবং জার্মানদের হাতে, সে সময়কে ভাসারি চিহ্নিত করেছেন মধ্যযুগ বা বর্বরযুগ হিসেবে। তিনিই সম্ভবত প্রথম শিল্প-ঐতিহাসিক যিনি মধ্যযুগকে বর্বরযুগ বলে চিহ্নিত করেন। তার পরবর্তী বিবর্তিত রূপ হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) নির্ভর রেনেসাঁ শিল্প (বিস্তারিত- ৩.৩.১.১)। যা সর্বোচ্চ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে মিকেলাঞ্জেলোর কাজের মধ্য দিয়ে। ভাসারি তৎকালীন রেনেসাঁর ভাবাদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সে সময়ের দার্শনিক এবং চিন্তকরা ধর্মীয় প্রভাবের বাইরে আসার চেষ্টা করেছেন। ফিরে যেতে চেয়েছেন গ্রিক সংস্কৃতি এবং দর্শনে। এই আত্মান্বেষণ-আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মীয় প্রভাব থেকে শিল্পকে পৃথক করার প্রবণতা ভাসারির শিল্পের ইতিহাস-পাঠকে প্রভাবিত করেছে। তিনি মধ্যযুগের ইতালি-স্পেনসহ অপরাপর উত্তর-ইউরোপ এবং মধ্য ইউরোপের সংস্কৃতিতে বাইজেনটাইন এবং জার্মান সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন। যা ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অবনতির কারণ। তিনি জার্মানসহ অপরাপর আফ্রিকার জনগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ দখল করেছে তাদের শিল্পকে 'প্রিমি লুমি' (primi lumi) বা 'আদিম অবস্থা' বলেছেন, যা কোনোভাবেই শিল্প নয়। এই ধরনের শিল্প বা স্থাপত্যকলাকে তিনি 'গীয়ত্ত' (Giotto) বলে চিহ্নিত করেন, ইংরেজিতে যাকে 'গথ'(Goth) বলে। ভাসারি বইয়ের ভূমিকাতে এ সম্পর্কে বলেন– "the Goths and the other barbarous and outlandish peoples who destroyed, together with Italy, all the finer arts." [Vasari, ১৯১২ [১৫৫৫]: xliv]।

শুধ তা-ই নয়, তারা গ্রিক ও রোমান ধ্রুপদী ভাস্কর্যগুলো ধ্বংস করে তার উপর নির্মাণ করেছে খ্রিস্টীয় গির্জা এবং পোপদের ভাস্কর্য, যার শিল্পমান অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং তা ইউরোপের শিল্পচর্চাকে এক আদিম অবস্থায় নিয়ে যায়। ফলে ইউরোপের শিল্পচর্চার অবনতি হয়, এবং বিচ্ছেদ ঘটে গ্রিক এবং রোমান সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার সাথে, সে জন্য তিনি দায়ী করেন জার্মান এবং খ্রিস্টানদের। তিনি মনে করেন, এ বিচ্ছেদ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ সম্পর্কে তিনি বলেন–

> Christian religion, which, after a long and bloody combat, with its wealth of miracles and with the sincerity of its works, had

> finally cast down and swept away the old faith of the heathens, and, devoting itself most ardently with all diligence to driving out and extirpating root and branch every least occasion whence error could arise, not only defaced or threw to the ground all the marvellous statues, sculptures, pictures, mosaics, and ornaments of the false gods of the heathens, but even the memorials and the honours of numberless men of mark, to whom, for their excellent merits, the noble spirit of the ancients had set up statues and other memorials in public places.
>
> [Vasari, ১৯১২ [১৫৫৫], xliv]

ভাসারি কেন গথ চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে শিল্প মনে করেন না, এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে হবে রেনেসাঁ যুগে 'শিল্প কী' ও 'শিল্পের উদ্দেশ্য কী' এসব প্রশ্নের আলোকে। ভাসারিসহ সে সময়কার অপরাপর চিন্তক এবং দার্শনিকগণ মনে করতেন শিল্পের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে তার বাস্তবতাকে উপস্থাপনের ক্ষমতা। গ্রিক-রোমান শিল্পের যে মাত্রায় বাস্তবতা উপস্থাপনের ক্ষমতা রয়েছে তা বাইজেনটাইন বা গথ শিল্পের নেই। সে কারণে তা নিম্নস্তরের শিল্প, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে শিল্পই নয়। গ্রিক-রোমান শিল্পের বাস্তবতা উপস্থাপনের ক্ষমতা পূর্ণতা পায় রেনেসাঁ যুগে পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর শিল্পে। তাই তিনি মনে করতেন, মিকেলাঞ্জেলোর কাজের মধ্য দিয়ে শিল্প সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এই পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর শিল্প বাস্তব জগৎকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতা রাখে। ফলে শিল্প হলো জগতের সত্য বয়ানের প্রামাণিক দলিল এবং এটাই তার উদ্দেশ্য। ভাস্কর্য যেহেতু ত্রিমাত্রিক জগৎকে নিখুঁত ভাবে উপস্থাপনের ক্ষমতা রাখে তাই তা চিত্রকলা থেকে উন্নত শিল্পমাধ্যম। রেনেসাঁ-উত্তর শিল্পচর্চা ও পর্যালোচনায় ভাসারির শিল্পের স্তরবিন্যাস, বিবর্তনবাদ ও শিল্পদর্শনের গভীর প্রভাব পড়ে। কানিংহাম, ফার্গুসনসহ অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তার বাইরে ছিলেন না। ভাসারি শিল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন–

> [T]hings are more noble and more perfect in proportion as they approach more nearly to the truth, and they say that sculpture imitates the true form and shows its works on every side and from every point of view, whereas painting, being laid on flat with most simple strokes of the brush and having but one light, shows but one aspect; and many of them do not scruple to say that sculpture is as much superior to painting as is truth to falsehood.
>
> [Vasari, ১৯১২ [১৫৫৫]: xxiv]

শিল্পের দায় বাস্তব সত্য উপস্থাপন এবং সত্যই শিল্পমান নির্ণয়ের মাপকাঠি তা ভাসারি সৃষ্ট নতুন কোনো ভাবনা নয় বরং তা এসেছে গ্রিকদের কাছ থেকে এবং এর প্রভাব শুধুমাত্র ভাসারি বা তাদের প্রজন্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা প্রভাব বিস্তার করেছিল বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। ভাসারিসহ রেনেসাঁ এবং রেনেসাঁ-উত্তর তাত্ত্বিক এবং দার্শনিকদের কাছে শিল্পের উদ্দেশ্য জগতের 'প্রতিচ্ছবি' উপস্থাপন। তাই রেনেসাঁ শিল্পে বাস্তবতার রূপক বা চিহ্নের কোনো স্থান নেই। যে দুই-চার জন রূপক বা চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, তারা মূলধারার বাইরে ছিলেন। সে কারণে ত্রিমাত্রিক জগৎকে দ্বিমাত্রিক উপরিতলে উপস্থাপনের একটি কৌশল উদ্ভাবন বৌদ্ধিক প্রয়োজনে পরিণত হয়। ভারতশিল্প বাস্তবতাকে উপস্থাপন করতে পারে না, তাই তা শিল্প নয়। 'Lack of realism or naturalism' [Parul, ২০০৬: ৪] সে কারণে তা অনুন্নত, যা সচেতন এবং অবচেতনভাবে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্র বা ভাস্কর্য শিল্প হয়ে ওঠার মূল শর্ত যদি হয় জগতের যথার্থ প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনের ক্ষমতা তবে তা করার সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল হচ্ছে জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল। এই কৌশল ব্রুনেলেসকি, রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলো ও লেওনার্দো দা ভিঞ্চির কাজের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এটা শাস্ত্রে পরিণত হয় ১৪৩৫ সালে লিও বাতিস্তা আলবের্তির (১৪০৪-১৪৭২) *দে পিক্তুরা (De Pictura)*, ১৪৭৪ সালে পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেসকার (১৪১২-১৪৭২) *দে পার্সপেকটিভা পিনজেনদি (De Perspectiva pingendi)* এবং ১৫০৫ সালে জাঁ পেলহার (১৪৪৫-১৫২২) *দে অর্তিফিচিয়ালি পার্সপেকটিভা (De Artificiali Perspectiva)* লেখাগুলোর মধ্যদিয়ে। পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের ভিত্তি হচ্ছে জ্যামিতিক সূত্র, রং বিষয়ক উপলব্ধি এবং আকার বিষয়ক ধারণা। এই ভিত্তিসমূহ রেনেসাঁ ও রেনেসাঁ-উত্তর পর্বে শিল্পের ব্যাকরণে পরিণত হয়। এই ব্যাকরণের প্রভাব এবং বিস্তৃতি ইউরোপের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা উপনিবেশকের হাত ধরে ভারতবর্ষেও প্রতিষ্ঠিত হয় একসময়। তাই সুলতানের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ– তার চিত্র 'ব্যাকরণসিদ্ধ' নয়। একই অভিযোগ উত্থাপিত হয় ভারতশিল্পের বিরুদ্ধেও। এই ব্যাকরণ হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর শিল্পচর্চার ব্যাকরণ। ভারতশিল্পের উপনিবেশায়নের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি এই জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত শিল্পকৌশল। তাই আমাদের প্রয়োজন জ্যামিতিক শিল্পকৌশলের বিস্তারিত আলোচনা। এটা যেমন একাধারে রেনেসাঁ-উত্তর পাশ্চাত্য শিল্পের ভিত্তি উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে, তেমনি ভারতশিল্পের স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানেও সহায়তা করবে।

৩.৩.১.১. জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত

'Perspective'(পরিপ্রেক্ষিত) শব্দের অর্থ 'আলোকে' 'দেখা' অথবা 'দৃশ্যসম্বন্ধীয়' কিন্তু চিত্রবিদ্যায় তার ব্যবহার বিশেষায়িত। এটি হচ্ছে চিত্র অঙ্কনের একটি কৌশল, যার মাধ্যমে ভ্রম তৈরি সম্ভব হয়। চিত্রবিদ্যায় 'পরিপ্রেক্ষিত' পদ্ধতি হল ত্রিমাত্রিক জগৎকে দ্বিমাত্রিক উপরিতলে উপস্থাপনের একটি কৌশল, যা বাস্তব জগতের বিভিন্ন বস্তুর আকার এবং সন্নিবেশকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে দর্শকদের কাছে চিত্রকর্মটি আরামদায়ক এবং স্বাভাবিক বলে মনে হয়। পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের মাধ্যমে বাস্তব জগৎকে শুধু উপস্থাপনই করা হয় না, তাতে প্রতিচ্ছবি নির্মাণের প্রচেষ্টা থাকে। তাই পরিপ্রেক্ষিত কৌশলে বস্তুর ঘনত্ব এবং আকৃতিরও আভাস থাকে। দ্বিমাত্রিক উপরিতলে ত্রিমাত্রিক ভ্রম নির্মাণের সরল পরিপ্রেক্ষিত কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

চিত্রঃ ৪ (ক) চিত্রঃ ৪ (খ)

চিত্র-৪ (গ) চিত্র-৪ (ঘ)
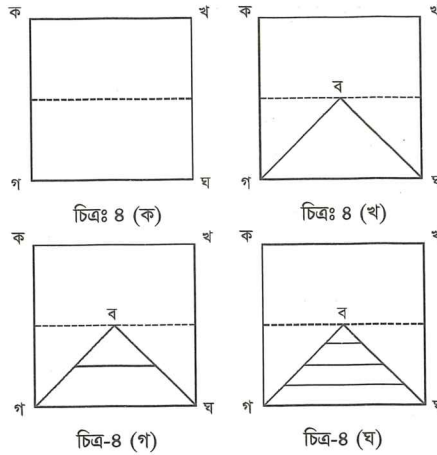
ধরা যাক ক, খ, গ, এবং ঘ একটি ক্যানভাসের চারটি কোণা এবং মধ্যবর্তী একটি বিন্দু হচ্ছে ব। ব বিন্দুটি হচ্ছে সেই বিন্দু, যা আমার চোখে সমান্তরাল এবং দৃষ্টিকেন্দ্র। ব বিন্দুকে চিত্রবিদ্যায় 'বিলীয়মান বিন্দু' বলে। গব এবং ঘব রেখা ব বিন্দুতে ছেদ করেছে। গব এবং ঘব রেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করলে ক্যানভাসে দ্বিমাত্রিক উপরিতলে ত্রিমাত্রিক ভ্রম নির্মিত হয়।

চিত্রকলার ইতিহাসে দ্বিমাত্রিক উপরিতলে ত্রিমাত্রিক ভ্রম নির্মাণের প্রচেষ্টা রেনেসাঁ-পর্বে শুরু হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। ভ্রম নির্মাণের প্রচেষ্টা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। চৈনিক, ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় এবং ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীরা আলো-ছায়ার মধ্য দিয়ে ঘনত্ব এবং গভীরতা উপস্থাপন করেছেন। ১৪২০ সালে ফিলিপো ব্রুনেলেসকি জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কার করেন কিন্তু তার আগেও অপরিপক্ক গাণিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল ব্যবহারের কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় ইতালির শিল্পীদের কাজে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল— অর্জিড ক্যাথিড্রালের *মাস্টার অফ সফিন* ফ্রেসকো এবং সিমোন মাতিনির *অর্সিনি*। এগুলো হচ্ছে অ-জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলে আঁকা অসাধারণ শিল্পের উদাহরণ। কিন্তু, জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলে তিনটি বিদ্যার অসাধারণ সমন্বয় হয়েছে— ১. আলোবিদ্যা ২. জ্যামিতি ৩. অঙ্কন কৌশল। তাই দা ভিঞ্চি তার নোটবুকে চিত্রবিদ্যাকে 'বিজ্ঞান' বা 'চিত্রবিজ্ঞান' বলে চিহ্নিত করে পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেন [Vinci, ২০০৮ [১৯৫২]: ১০৮]। তিনি নোটবুকে 'দি আর্ট' অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করেন দৃষ্টিতত্ত্ব এবং আলোতত্ত্ব নিয়ে, পরবর্তী সময়ে তার সাথে পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত করেন। তিনি পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনার শুরুতেই বলেন–

> Painting is based upon perspective which is nothing else than thorough knowledge of the function of the eye. And there function simply consists in receiving in a pyramid the forms and colors of all objects placed before it.
>
> [Vinci, ২০০৮[১৯৫২]: ১১২]

বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত অসমাধিত সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আলোতত্ত্ব। আজও মূলধারার বিজ্ঞান আলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে নির্দিষ্ট অবস্থান নিতে পারেনি। তা কখনো কণাধর্মী চরিত্র প্রকাশ করে, কখনো আবার তরঙ্গধর্মী চরিত্র। দা ভিঞ্চিসহ অপরাপর প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের কাছে আলোর উৎপত্তি সম্পর্কিত প্রশ্নও জরুরি ছিল। গ্রিক দার্শনিক ইউক্লিড মনে করতেন, চোখ থেকে আলো নির্গত হয় এবং তা যখন বস্তুর উপরিভাগে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসে চোখে, তখন আমরা সেই বস্তুকে দেখতে পাই। তার ধারণা ইবনে হাতাম ভুল প্রমাণ করেন আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ প্রথম সহস্রাব্দে। তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন চোখ থেকে আলো নির্গত হয় না, বরং চোখে আলো প্রতিফলিত হলে আমরা তা দেখতে পাই এবং সেই সাথে দূরত্বের সাথে সাথে বস্তুর রঙের ফারাক হয়। হাতাম এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সাত খণ্ডে রচিত *কিতাব-আল-মনাজির* বইয়ে। *কিতাব-আল-মনাজির* পরবর্তী কয়েক শতকে

আলো সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রভাবশালী বইয়ে পরিণত হয়। সম্পূর্ণ মনাজির আনুমানিক ১২৭০ সালে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয় *দে অস্পেকতিবুস* (*De Aspectibus*) নামে। পরবর্তী সময়ে, ১২৭৮ সালের দিকে *দে অস্পেকতিবুস* গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে উতিলো (১২৩০-১২৮০) *পার্সপেকটিভা* (*Perspectivae*) নামে ১০ খণ্ডের একটি বই প্রকাশ করেন, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার, ফিলিপো ব্রুনেলেসকি, লিও বাতিস্তা আলবের্তি, পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেসকা, যোহান পেলরিন, দা ভিঞ্চিসহ আরো অনেকের কাজে বিস্তর প্রভাব রাখে। তাই অনেক গবেষকের মতে, হাতাম-এর আলোতত্ত্ব ব্রুনেলেসকি, আলবের্তি এবং দা ভিঞ্চির জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সে কারণে আলবের্তি মনে করতেন শিল্পীর কাজ হচ্ছে জানালা বা ছিদ্র দিয়ে বহির্জগতের যে আকার এবং রং শিল্পী প্রত্যক্ষ করেন তা উপস্থাপন করা। এই আলোক-রশ্মি সকল বস্তুকে একইভাবে উপস্থাপন করে না। তা কাছের বস্তুকে বড় ও দূরে থাকা বস্তুকে ছোট দেখায়; এবং কাছের বস্তুকে পরিচ্ছন্ন ও দূরের বস্তুকে অপরিচ্ছন্ন ধোঁয়াটে দেখায়; এবং সেই সাথে কাছের বস্তুকে উজ্জ্বল বর্ণের ও দূরের বস্তুকে হালকা রূপে উপস্থাপন করে। জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর চিত্র আঁকতে আলোর এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নেওয়া হয়। তাই, পরিপ্রেক্ষিতকৌশল আলোতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে দা ভিঞ্চি বলেন–

> There are three branches of perspective; the first deals with the reasons of the (apparent) diminution of objects as they recede from the eye, and is known as Perspective of Diminution; the second contains the way in which colors vary as they recede from the eye; the third and last explains how objects should appear less distinct in proportion as they are more remote. And the names are as follows: Linear perspective, the perspective of color, the perspective of disappearance.
>
> [Vinci, ২০০৮[১৯৫২]; ১১২]

চিত্র-৫ ব্রুনেলেসকির চিত্র পরীক্ষণ কৌশল

কী অনুপাতে আকার ছোট হবে, কী অনুপাতে রং বদলাতে থাকবে, কী অনুপাতে সুস্পষ্ট হয়ে থাকবে— এসবের সমাধান দিয়েছে গণিত। দা ভিঞ্চি পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন– ১. একরৈখিক পরিপ্রেক্ষিত, ২. রং বিষয়ক পরিপ্রেক্ষিত, ৩. হ্রাসবিষয়ক পরিপ্রেক্ষিত। সেখানে তিনি পরিপ্রেক্ষিতবিষয়ক কতগুলো সূত্র প্রদান করেন, যা পরবর্তী সময়ে চিত্রকলার ব্যাকরণে পরিণত হয়। এই ব্যাকরণ এবং সূত্রগুলোর প্রভাব শুধু ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা পরে ভারত-আফ্রিকাসহ ইউরোপের সকল উপনিবেশে বিস্তৃতি লাভ করে।

যথার্থভাবে পরিপ্রেক্ষিত অঙ্কনের জন্য প্রয়োজন ভ্যানিসিং পয়েন্ট বা বিলীয়মান বিন্দু নির্ধারণ করা। আমাদের পূর্বের চিত্রে বিলীয়মান বিন্দু হচ্ছে 'ব'। ব্রুনেলেসকি যথার্থভাবে পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর শিল্প অঙ্কন করলেও তিনি গাণিতিক ব্যাখ্যা এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেননি। যথার্থভাবে বিলীয়মান বিন্দু চিহ্নিত করা খুবই প্রয়োজন কারণ এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হয় ছবির প্রতিটি বস্তু কতদূরে কোন কোণে আছে। ক্যানভাসের বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন রেখা বিলীয়মান বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়। এই রেখাগুলোর উপর বা রেখাগুলো ছুঁয়ে বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা অঙ্কন করা হয়ে থাকে। এই বিলীয়মান বিন্দু চিহ্নিত করে যথার্থভাবে ব্রুনেলেসকি ফ্রেস্কো অঙ্কন করলেও, প্রথম ১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে গাণিতিক পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আলবের্তি তার 'দে পিক্তরা' প্রবন্ধে। পরে পেলহা, যিনি গীয়ত্ত নামে পরিচিত, ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে *দে অর্তিফিচিয়ালি পার্সপেকটিভা* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পেলহার বিলীয়মান বিন্দু নির্ণয় করার পদ্ধতিকে 'ডিস্টেন্ট পয়েন্ট মেথড' বলা হয়। আলবের্তি এবং পেলহার গাণিতিক পদ্ধতি সাধারণ শিল্পীদের জন্য বোধগম্য ছিল না। পিয়েরো শিল্পী এবং গণিতবিদ ছিলেন। তার পদ্ধতি সে সময়কার বিখ্যাত শিল্পীগণ ব্যবহার করতেন। এই তিনটি পদ্ধতি একই, তা গণিতবিদদের প্রমাণ করতে সময় লেগেছিল দুই শত বছর। নিচে বিলীয়মান বিন্দু নির্ণয় করার পদ্ধতির দুটি ছবি দেওয়া হলো।

চিত্র-৬ বিলীয়মান বিন্দু নির্ণয় করার পদ্ধতি

বাইজেনটাইন চিত্রকলা, টেম্পোরা, ষষ্ঠ শতক

দুচ্চিও দি বুঅনিস্লেগ্না, দি কলিং অব দি অ্যাপোস্টিলস, পিটার এন্ড অ্যান্ড্রু, টেম্পোরা, ১৩০৮
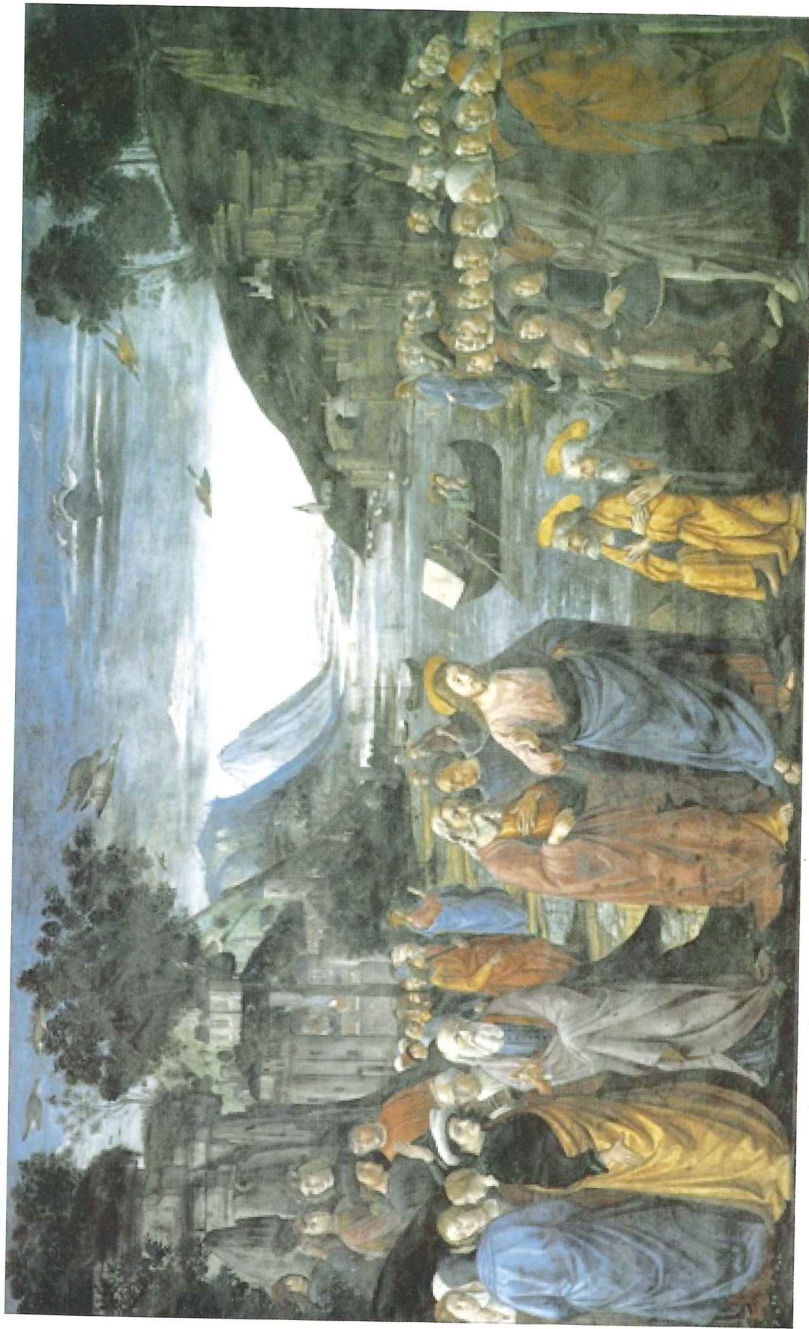
ডমেনিক ঘির্লান্দিও, দি কলিং অব দি অ্যাপোস্টলস, দেয়াল চিত্র, ১৪৮১
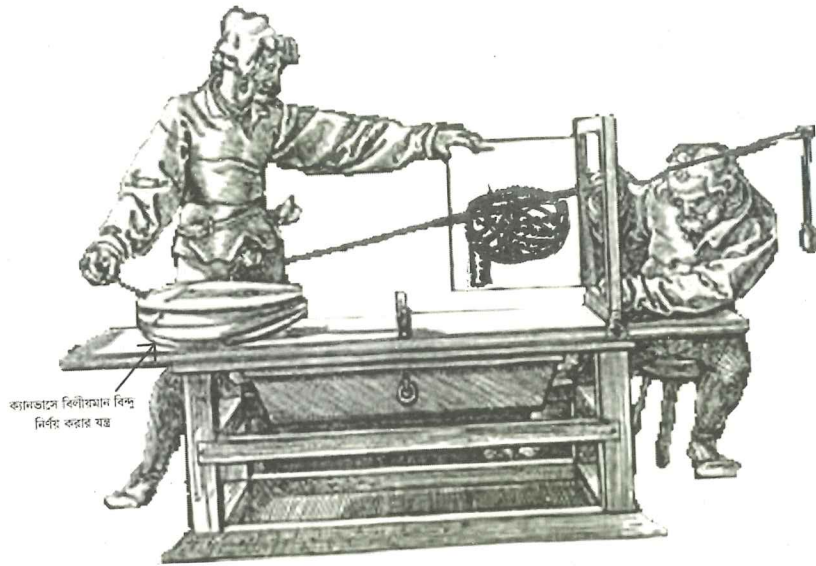
চিত্র-৭ বিলীয়মান বিন্দু নির্ণয় করার যন্ত্র

সকল চিত্রে কমবেশি পরিপ্রেক্ষিত থাকে। আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের দিকে যিশু খ্রিস্টের অনেক ঘটনার উপর ভিত্তি করে কিছু বাইজেনটাইন টেম্পোরা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এন্ড্রু এবং পিটার নামে দুই জেলেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় একই ঘটনা চিত্রায়িত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্যও রয়েছে। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে অ-জ্যামিতিক কৌশল ব্যবহার করে বুঅনিস্নেগ্না একটি চিত্র (*দি কলিং অব দি অ্যাপোস্টিলস*, ১৩০৮) অঙ্কন করেন। ছবিটিতে আলো-ছায়া ব্যবহার করে পরিপ্রেক্ষিত অঙ্কন করা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে গাণিতিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করে একই বিষয়ে ছবির উদাহরণ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ডমেনিক ঘির্লান্দিও-এর *দি কলিং অব অ্যাপোস্টিলস* (১৪৮১) উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তিনটি ছবি আমাদের ভিন্ন ধরনের পরিপ্রেক্ষিতকৌশল বুঝতে সহায়তা করবে।

৩.৩.১.২. ভারতশিল্পে পরিপ্রেক্ষিত

ভারতের অপরাপর বিষয়ের মতো ভারতশিল্পের ইতিহাস অসমাপ্ত এবং খণ্ডিত। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় ভারতে দীর্ঘ শিল্পচর্চার ইতিহাস রয়েছে। শিল্পতত্ত্ব নিয়ে লিখিত কিছু সূত্রসাহিত্যের নজির পাওয়া গেলেও শিল্পের ইতিহাস বিষয়ক কোনো সূত্রের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তাই, ভারতশিল্পের ইতিহাস নির্মাণের জন্য নির্ভর করতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং সময় ও বাস্তবতার প্রয়োজনে উপনিবেশের ছোবল থেকে বেঁচে যাওয়া শিল্পচর্চার মধ্যে।

ভারতের চিত্রকলার কৌশলগত দিক বিবেচনা নিয়ে একে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— ১.অজন্তা চিত্রকলা ২.মুঘল চিত্রকলা। অন্যদিকে, ভিত্তির উপর নির্ভর করে ভারতীয় চিত্রকলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— দেয়াল চিত্র বা ম্যুরাল এবং ক্ষুদ্রাকৃতির বা মিনিয়েচার। তালপাতা, কাপড়, কাগজ, কাঠসহ অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতির উপরিতলে আঁকা চিত্রকে মিনিয়েচার বলে। মুঘলদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মিনিয়েচার জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিণত হলেও পাল রাজাদের সময় থেকেই বাংলায় তালপাতায় আঁকা মিনিয়েচারের সূত্রপাত, যার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। সাঞ্চি ও বারহুতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে কাঠের উপর খোদাই করা মিনিয়েচার আবিষ্কৃত হয়েছে। দেয়ালচিত্রের ইতিহাস মিনিয়েচার থেকে প্রাচীন। বিগত শতকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের দেয়ালচিত্র আবিষ্কার করেছেন— মধ্যভারতের কৈমুর পর্বতে, উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায়, মধ্য ভারতের বিন্ধ্য গুহায়। ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ দেয়ালচিত্র পাওয়া যায় অজন্তায়। দেয়ালচিত্র এবং মিনিয়েচারের অঙ্কন-কৌশলের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতের কোনো ব্যবহার নেই। এখন প্রশ্ন হলো, কেন রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহৃত হয়নি? কেন ভারতবর্ষে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল উদ্ভাবন হলো না? ভারতশিল্পে বিকল্প কোনো পরিপ্রেক্ষিত কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে কি না তা অনুসন্ধানে মনোযোগ দেয়া যাক।

বর্তমান পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে এটি অতিরিক্ত অনুমান হবে না যে, ভারতবর্ষের চিত্রকলার বিকাশ হয়েছে কয়েক হাজার বছরের পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা যথার্থ প্রমাণের জন্য যে পরিমাণ লিখিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রয়োজন, তা অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে অনেক বিবর্তনবাদীগণ মনে করেন, আনুমানিক ষাট থেকে আশি হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে আরব সাগরের তীরবর্তী এলাকা দিয়ে হেঁটে ভারতবর্ষে প্রথম মানুষ এসেছে। সময় এবং আগমন জ্ঞানজগতে বিতর্কাতীত নয়। কিন্তু, যেখান থেকেই মানুষ এসে থাকুক না কেন, মানব জাতির এক অবিরাম বিকাশ অনস্বীকার্য। একই জায়গায় বারবার নির্মিত হয়েছে স্থাপনা; ফলে ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক কারণে পরিত্যক্ত না হলে সেখানে অতীতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন। অন্যদিকে, পরিত্যক্ত নিদর্শন ছাড়া অপরাপর মাধ্যম যেমন– লিখিত ইতিহাস এবং রক্ষিত চিহ্ন বা নিদর্শনের সংখ্যাও অপ্রতুল। সে কারণে ভারতশিল্পের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণ যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। কিন্তু, ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছরের পুরাতন সংস্কৃতি কখনো-কখনো অপরিবর্তিত কখনো আংশিক পরিবর্তিত রূপে ক্রিয়াশীল। সেই সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে কিছু শিল্পচর্চা এবং শিল্পকর্ম আজও টিকে আছে। তা ইতিহাস-চেতনা থেকে নয়, বরং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে। বর্তমানে ভারতশিল্পের ইতিহাস নির্মাণে দুটো উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বিন্ধ্য বা কৈমুর পর্বতে প্রাপ্ত গুহাচিত্র বিভিন্ন সময়ে আঁকা হয়েছে। ধারণা করা হয় বিন্ধ্য গুহার প্রাচীনতম দেয়াল চিত্রগুলো আনুমানিক ১০,০০০ বছর আগে আঁকা হয়েছে। এই গুহাচিত্রগুলোর বিষয়বস্তু মূলত পশুশিকার। গুহাচিত্রে আঁকা পশুগুলোর মধ্যে রয়েছে হাতি, মহিষ, ছাগল, হারিল, ঘোড়া, গণ্ডার এবং বানর। এখানে উল্লেখ্য, ঋক্‌বেদের উপর নির্ভর করে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকগণ মনে করেন বেদ রচয়িতারা ভারতে আগমনের সময় ঘোড়া নিয়ে এসেছে এবং তাদের আগমনের কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০-১৫০০ অব্দে তারা ভারতে এসেছে। এক্ষেত্রে বিন্ধ্য গুহায় আঁকা ঘোড়ার চিত্রগুলোর বয়স নিয়ে যেমন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় তেমনি বেদ রচয়িতাদের সাথে ভারতে ঘোড়া এসেছে কি-না তা নিয়েও পুনঃগবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এই গুহাচিত্রগুলোর সঙ্গে স্পেনের গুহাচিত্রের মিল পাওয়া যায়। পশুর চর্বির সাথে বিভিন্ন রঙের মাটির গুড়া ব্যবহার করে রং তৈরি করা হয়েছে। ধারণা করা হয়ে থাকে, গাছের আঁশ দিয়ে তৈরি তুলির মাধ্যমে চিত্রগুলো আঁকা হয়েছে। চিত্রগুলো পাশ থেকে আঁকা এবং দ্বিমাত্রিক। রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল ব্যবহারের কোনো প্রচেষ্টা সেখানে ছিল না।

উড়িষ্যার যোগিমারা গুহায় কিছু চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকে এগুলো আঁকা হয়েছে। প্রায় একই সময়ে সাঞ্চি এবং বারহুতে কিছু বৌদ্ধ ভাস্কর্য, ঘরবাড়ি এবং কাঠের উপর বোধিসত্ত্বের চিত্র পাওয়া যায়। এখানে

উল্লেখ্য, সাঞ্চি এবং বারহুতের বৌদ্ধ ভাস্কর্যগুলো অসাধারণ শিল্পনিদর্শন। এই ভাস্কর্যগুলো নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যোগিমারা, সাঞ্চি এবং বারহুতের চিত্রগুলোও পাশ থেকে আঁকা এবং দ্বিমাত্রিক।

ভারতের সবচেয়ে বিকশিত দেয়ালচিত্র পাওয়া যায় অজন্তায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০ সাল থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই গুহাচিত্রগুলো অঙ্কিত হয়েছে। ১৮১৯ সালের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু সৈন্য মহারাষ্ট্রে জঙ্গলে শিকার করার সময় অজন্তা গুহার সন্ধান পায়। অজন্তায় ২৯টি গুহা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু গুহা প্রাকৃতিক এবং কিছু পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে। অজন্তার ৯, ১০, ১১ এবং ২৬ নম্বর গুহাগুলো চৈত্র অর্থাৎ প্রার্থনার স্থান এবং অপরগুলো ভিক্ষুর বাসস্থান ছিল। এদের মধ্যে ১, ২, ৯, ১১, ১৬, ১৭, ১৯ ও ২১ নম্বর গুহায় সর্বাধিক চিত্র রয়েছে। এই গুহাগুলো নির্মাণ করেছেন বৌদ্ধ শিল্পীগণ। বৌদ্ধধর্মকে বড় দাগে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে– মহাযান এবং থেরবাদ (হীনযান)। ৮ থেকে ১৩ নম্বর গুহাগুলো থেরবাদের সাথে সম্পর্কিত এবং এগুলো প্রথম দিকে নির্মাণ করা হয়েছে। বাকি সব মহাযানের সাথে সম্পর্কিত। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, অজন্তায় শিল্পকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হত। এই তথ্য যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে বলা যেতে পারে অজন্তাই পৃথিবীর প্রথম শিল্পশিক্ষার বিদ্যানিকেতন। হিউয়েন সাঙ-এর বই থেকে আরো জানা যায় পঞ্চম শতকের বিখ্যাত বৌদ্ধ যুক্তিবিদ দিঙনাগ কিছুকাল অজন্তায় ছিলেন। এই দেয়ালচিত্রগুলো বিভিন্ন রঙের মাটি ও পাথরের গুড়ার সাথে চুনাবালি মিশিয়ে অঙ্কন করা হয়েছে। ফলে, দেয়ালচিত্রে রঙের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি ব্যবহৃত উপকরণের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়নি বলে রং এখনও উজ্জ্বল বর্ণের রয়েছে। অজন্তার দেয়ালচিত্র অঙ্কন-কৌশল এখনও মন্দির এবং মসজিদে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিল্প গবেষকগণ মনে করেন, অজন্তা ভারতশিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। অজন্তার দেয়ালচিত্রের বিষয়বস্তু বুদ্ধের জীবন এবং জাতকে বর্ণিত বুদ্ধের পূর্ববর্তী জীবনের ঘটনার বয়ান। বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শনচর্চায় এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। সম্ভবত, ধর্ম এবং নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য এই চিত্রগুলো আঁকা হয়েছে। সেই সময় বই বা পুথি সুলভ না থাকায় জাতকের ঘটনা বয়ানের মধ্য দিয়ে ধর্ম এবং নীতিশিক্ষার চল ছিল। ফলে, প্রতিটি দেয়ালচিত্রের সাথে অপর চিত্রের সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে কোনো প্রতীক বা চিহ্নের মাধ্যমে। প্রতিটি চিত্র সম্পূর্ণ দেয়াল নিয়ে আঁকা হয়েছে। এখানে প্রকৃতি গৌণ এবং মানুষ মুখ্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর ইউরোপীয় চিত্রে মানুষকে প্রকৃতির অংশ রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই

অজন্তার দেয়াল চিত্রের অনুকৃতি

চিত্রগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে সাধারণ মানুষের জীবন এবং সংস্কৃতি। তবে তা সম্ভবত অঙ্কনকালের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। বুদ্ধের জীবনকালের সংস্কৃতি এবং কাপড়ের সাথে অঙ্কিত চিত্রের পার্থক্য রয়েছে। দেয়ালচিত্রে নারী স্বতন্ত্র সত্তা এবং সগৌরবে পূর্ণ। নারী কখনো মাতা রূপে, কখনো রাজ্ঞীরূপে, কখনো প্রণয়িনীরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। নারীর রূপ অনুসারে অজন্তার নারী কখনো বলিষ্ঠ, কখনো লাবণ্যময়, কখনো উজ্জ্বল, কখনো বাদামি বর্ণের। সুলতানের চিত্রে অঙ্কিত নারীর সাথে অজন্তার নারীর অবয়ব এবং রং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে [বিস্তারিত- ৬.২.৩]।

অজন্তার পর মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ইলোরা ভারতের অন্যতম শিল্পনিদর্শন। ইলোরায়ও ভাস্কর্যের সাথে সাথে দেয়ালচিত্র পাওয়া গেছে। মুঘল যুগে দেয়ালচিত্র তুলনামূলক কম। আকবর ফতেপুর সিক্রি এবং লাহোরের প্রাসাদ-দেয়ালে কিছু চিত্র অঙ্কন করিয়েছিলেন। অজন্তা বা ইলোরার দেয়ালচিত্রে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের ব্যবহার নেই। এই দেয়ালচিত্রে পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে কি না বা সেগুলো জ্যামিতিক কোনো আকার অনুসরণ করে কি না তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে পরে।

মিনিয়েচার ক্ষুদ্রাকৃতির পরিবহনযোগ্য উপরিতলে অঙ্কনকৃত চিত্র। কাগজ, কাপড়, তালপাতা, ছোট পাথর, মাটির পাত্রের উপর অঙ্কিত চিত্র মিনিয়েচারের উদাহরণ। বাংলার পাল রাজাদের সময় তালপাতার উপর বোধিসত্ত্বের চিত্রসহ সহজযান এবং বজ্রযানীদের বিভিন্ন প্রতীক এবং দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করা হত। বিশেষ করে প্রজ্ঞাপারমিতার সূত্রগুলোর পাশে আঁকা চিত্রগুলো ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে সংগৃহীত আছে।

ভারতে মুঘল মিনিয়েচার অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় হুমায়ুনের রাজত্বকালে। বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সাম্রাজের প্রতিষ্ঠা করলেও, মুঘল মিনিয়েচার চর্চা শুরু হুমায়ুনের সময় থেকে। হুমায়ুন শেরশাহের কাছে পরাজিত হয়ে ১৫৪০ সালে দিল্লি থেকে পালিয়ে পারস্যের শাসনকর্তা শাহ তহমাসপের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময় সাফাভিদ শিল্পীদের কাজের সাথে তিনি পরিচিত হন। অন্যতম সাফাভিদ শিল্পী ছিলেন কামাল উদ্দিন বিহজাদ এবং তার বিখ্যাত শিষ্যরা হলেন আগা মিরাক, ঘোসেম আলী চেহরাগোসাই, মীর মোসাবার এবং শেখ জাদে। মীর সৈয়দ আলি নামের একজন শিল্পী *নিজামির খামসা* পুথির চিত্ররূপদান করে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি বিহজাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তার কাজ দেখে হুমায়ুন মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই, ১৫৫৫ সালে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লি দখল করে ফিরে এলে মীর সৈয়দ আলিকে *আমির হামজা* আঁকার

জন্য নিযুক্ত করেন। যদিও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় দিল্লি দখলের আগেই *আমির হামজার* কাজ শুরু হয়েছিল তবে সে সময় এ কয়েকটি চিত্র আঁকা হয়েছিল। সম্পর্ণ প্রকল্পের অনুমোদন করেছিলেন আকবর [Dalrymple, ২০০৩]। *আমির হামজায়* ২২.২৫´´X২৮´´ আকারের কাপড়ের উপরে আঁকা ১৪০০ চিত্র স্থান পেয়েছিল। মীর সৈয়দ আলিকে আবদুস সামাদসহ আরো অনেক ভারতীয় শিল্পী এই কাজে সহায়তা করেন। *আমির হামজার* অনেকগুলো চিত্র ইউরোপের বিভিন্ন জাদুঘরে এখনো দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ে মুঘলচিত্রে পারস্যচিত্রের রেখা এবং রঙের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ করে আনুমানিক ১৫৭৫ সালের দিকে *আমির হামজার* 'আমির হোসেন' চিত্রে ভারতীয় অঙ্কন-কৌশলের খানিকটা প্রভাব দেখা যায়। পারস্যচিত্রে রেখা এবং রঙের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু মুঘলচিত্রে রেখা এবং আকারের প্রাধান্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মুঘল দরবারে পারস্য শিল্পীদের সহযোগী পদে ভারতীয় শিল্পীরা কাজ করতেন। অনেক গবেষকদের মতে, এই ভারতীয় শিল্পীগণ অজন্তার বৌদ্ধ শিল্পীদের উত্তরাধিকারী। এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এই গবেষণা আকবরের দরবারের ঐতিহাসিক আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরীকে* ভিত্তি করে শুরু হতে পারে।

মুঘল শিল্পীদের বিষয়বস্তু হচ্ছে মুঘল উচ্চশ্রেণির জীবনযাত্রার বয়ান। তাই তাদের চিত্রে উঠে এসেছে দরবারের দৃশ্য, শোভাযাত্রা, শিকারের দৃশ্য এবং যৌনজীবন। এ ছাড়া মহাভারত, রামায়ণসহ অন্যান্য ধ্রুপদী সাহিত্যের চিত্রায়ণও মুঘল অর্থায়নে হয়েছে। রাজপুতানা এবং পাহাড়ি মিনিয়েচারে অঙ্কনগত দিক থেকে মুঘল মিনিয়েচারের প্রভাব লক্ষণীয়; যদিও রাজপুত মিনিয়েচারের প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কন প্রোফাইল বা অর্ধাস্য কিন্তু মুঘলচিত্র প্রোফাইল এবং দুই-তৃতীয়াংশ কৌশলে আঁকা হয়েছে। বিষয়বস্তু বিবেচনায় রাজপুতানা এবং পাহাড়ি মিনিয়েচারের সাথে মুঘল মিনিয়েচারের পার্থক্য রয়েছে। রাজপুত মিনিয়েচারের বিষয় লোকজ জীবন, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনিসহ আঞ্চলিক পৌরাণিক ঘটনা। রাজপুত এবং পাহাড়ি চিত্রে অল্পবিস্তর পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মুঘলচিত্রে প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিপ্রেক্ষিত চর্চার উদাহরণ পাওয়া যায়। এমনকি মুঘলচিত্রে প্রোফাইল এবং দুই-তৃতীয়াংশ কৌশলে আঁকা প্রতিকৃতির উদাহরণও রয়েছে। কিন্তু রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত চর্চার উদাহরণ নেই। কিন্তু মুঘলরা ইউরোপীয় রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর শিল্পের সাথে পরিচিত ছিলেন। তা নিশ্চিত হওয়া যায় জাহাঙ্গীরের আমলে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের রাজদূত টমাস রো-র আত্মজীবনী থেকে। টমাস রো ১৬১৫ থেকে ১৬১৮ সাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীরের দরবারে ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে জাহাঙ্গীরের সুনজর লাভের জন্য তিনি বেশ কিছু উপহার

শাহ তহমাসপের দরবারে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন, ষোড়শ শতক

দিয়েছিলেন। তার মধ্যে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলে আঁকা ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের শিল্পীদের কিছু ছবিও ছিল। যে সব শিল্পীদের ছবি উপহার দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইংরেজশিল্পী আইজাক অলিভার। ছবিগুলো উপহার দেওয়ার সময় রো জাহাঙ্গীরকে বলেছিলেন, ছবিগুলো আধুনিক কৌশলে আঁকা তৈলচিত্র এবং তা ভারতের শিল্পীদের চেয়ে উন্নততর। জাহাঙ্গীর তখন বলেছিলেন, এই ধরনের চিত্র মুঘল শিল্পীদের পক্ষে আঁকা সম্ভব। তার প্রত্যুত্তরে রো বলেছিলেন, যদি কেউ তা নকল করতে পারে তবে তাকে ৫০ রুপি তিনি দিবেন। পরের দিন সকালে রো ঘুম থেকে উঠে লক্ষ করলেন তার বিছানার চারপাশে একই ছবির চারটি নকল রয়েছে এবং তার অনেক কষ্ট হয়েছিল মূলটি খুঁজে পেতে। সেই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় রো-এর ব্যক্তিগত জীবনীতে—

> I was sent for to the Durbar, The busines was about a Picture I had lately giuen the king and was Confident that noe man in India could equall yt . So soone as I came hee asked mee what I would giue the Paynter that had made a Coppy soe like it that I should not knowe myne owne. I answered: a Painters reward 50 rupees.
>
> [Roe, ১৯৫৮ [১৬৩১]: ২১৩]

কিন্তু অনুকৃতি আঁকা এবং জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল রপ্ত করা এক বিষয় নয়। চিত্রের কৌশল অনুসরণ না করেও নকল আঁকা সম্ভব। কিন্তু জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল শেখার প্রতি মুঘল শিল্পীদের মধ্যে কোনো আগ্রহের কথা রো-এর আত্মজীবনীতে পাওয়া যায় না। তার বৌদ্ধিক কারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে [বিস্তারিত- ২.২.]। বৌদ্ধিক কারণ ছাড়া কিছু ব্যবহারিক কারণও রয়েছে।

রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত অঙ্কনের জ্যামিতিক কৌশল উদ্ভাবনের জন্য তিনটি জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্ত আছে— ১. আলো, ২. জ্যামিতি, এবং ৩. রঙের সঠিক জ্ঞান। রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত অঙ্কন-কৌশলের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুকে যথার্থভাবে উপস্থাপন, তাই দূরত্বের সাথে সাথে বস্তুর আকৃতি ছোট এবং রং ধূসর হতে থাকে। আলো এবং রং সম্পর্কিত লৌকিক জ্ঞান সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও জ্যামিতিক কৌশল একটি বিশেষায়িত জ্ঞান। কিন্তু আর্যভট্ট এবং ভাস্করাচার্য দশম শতকের দিকে

ত্রিকোণমিতি এবং জ্যামিতির উন্নয়ন সাধন করেছিলেন; রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল উদ্ভাবনের জন্য খানিকটা উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল। তা করতে বড়জোর কয়েক দশক থেকে দুই-চার শতক প্রয়োজন হতো। কিন্তু তা হয়নি। অনেকের মতে, এ অঞ্চল গ্রীষ্মপ্রধান হওয়ায় সূর্যের আলো তুলনামূলকভাবে তীব্র থাকার কারণে দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে আকারের তারতম্য হলেও রঙের পরিবর্তন হয় না। সে কারণে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি এ অঞ্চলের শিল্পীদের আগ্রহ কম ছিল। তাছাড়া, আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি ভারতশিল্পের অভিমুখিতা এবং প্রবণতা ইউরোপ থেকে ভিন্ন। ইউরোপ যখন সরলভাবে জগতের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করতে নিয়োজিত তখন ভারতীয় শিল্পীদের উদ্দেশ্য পারমার্থিক সত্য উপস্থাপন, যা একই সাথে কাল এবং স্থাননিরপেক্ষ এবং বিশেষ ব্যক্তিসাপেক্ষ অবশ্যই নয়। জগতের প্রতিচ্ছবির চেয়ে পারমার্থিক সত্য বয়ান তার মূল উদ্দেশ্য। ফলে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে উপস্থাপনের কোনো প্রচেষ্টা সেখানে নেই। যে প্রতীকের মাধ্যমে চিন্তা প্রকাশ করা হয় তা হল ভাববস্তু। এই ভাববস্তু বাস্তব জগৎ থেকে উদ্বুদ্ধ হলেও তা বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি নয়। সে কারণে বাস্তব জগতে সেই বস্তুর চারপাশে থাকা বস্তুগুলো সম্পূর্ণ অগুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক সময় তা ভাবপ্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। তাই, জগতের প্রতিচ্ছবির প্রতি অনাগ্রহই শুধু নয়, বৌদ্ধিকভাবেও তা অপ্রয়োজনীয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তাই রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল উদ্ভাবন এ অঞ্চলের বৌদ্ধিক চিন্তা এবং তৎপরতার জন্য আবশ্যিক ছিল না।

ভারতশিল্পের মূল লক্ষ্য যেহেতু ভাবপ্রকাশ, সেহেতু ভাবপ্রকাশের কৌশল উদ্ভাবন জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং চর্চার দাবিদার। এ কারণে ভাবপ্রকাশের জটিল সব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে ভারতশিল্পে। মিকেলাঞ্জেলো যখন সিস্টিন চ্যাপেলে বাইবেলের ছবি অঙ্কন করেন সেই চিত্রগুলোর প্রতিটি ছিল সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র; একটির অর্থ নির্ণয়ের জন্য অপরটির উপর নির্ভর করতে হত না। কিন্তু অজন্তার দেয়ালচিত্রগুলোর এক দেয়ালের সাথে অপর দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রের সম্পর্ক রয়েছে, তাই বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে এক দেয়ালচিত্র থেকে অন্য দেয়ালচিত্রে। তাছাড়া বস্তুর আকৃতি ছোটবড় করার মধ্য দিয়ে অন্য বস্তুর সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে। একই সাথে অঙ্কনের ক্ষেত্রে বৃত্ত এবং উপবৃত্তের ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত অঙ্কনের ক্ষেত্রে রৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে বৃত্তাকার পরিপ্রেক্ষিত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপবৃত্ত পরিপ্রেক্ষিতও ব্যবহার করা হয়েছে। এই বৃত্তাকার পরিপ্রেক্ষিতে দুই ধরনের বিভাজন রয়েছে, যার মাধ্যমে চিত্রের গতি এবং অভিমুখকে নির্দেশ করা হয়। এ সম্পর্কে এলিস বোনা (১৮৮৯-১৯৮১) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এলিস বোনা সুইডেনের শিল্পী এবং ভারততত্ত্ববিদ। তিনি ১৯৪০ সালে ইলোরার ভাস্কর্যগুলোর নকল আঁকতে গিয়ে লক্ষ করলেন পশ্চিমা কৌশল ব্যবহার করে ভাস্কর্যগুলো যথাযথভাবে আঁকা সম্ভব হচ্ছে না। একই সাথে তিনি লক্ষ করলেন ভাস্কর্য এবং চিত্রের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত আকার আছে। কিন্তু সে সময়কার মূলধারার শিল্পতাত্ত্বিকদের মতে, ভারতে একটি শিল্পকর্মে ব্যবহৃত কৌশল অপরটি থেকে পৃথক এবং মৌলিক কোনো জ্যামিতিক আকারের ব্যবহার সেখানে নাই। হাইনরিখ জিমার (১৮২৩-১৯০০) ম্যাক্স মুলারের পর সবচেয়ে বিখ্যাত এবং আলোচিত জার্মান ভারততত্ত্ববিদ এবং ভারতশিল্পতাত্ত্বিক। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন–

> [Each separate form element] seems to be floating in the air all by itself. They all enjoy a life of their own and do not depend on any free artistic economy that would govern the detail of their appearance and build them up together, as supporting parts, into a structured whole. The meaning of whatever might appear individual in them does not depend on their being related to an artistic total that would control them throughout, turning them into mere members of an artistic organism.
>
> [উদ্ধৃত হয়েছে Boner, ১৯৬২: Preface]

বোনা তার *প্রিন্সিপালস অফ কম্পোজিশন ইন হিন্দু স্কাল্পচারস (Principles of Composition in Hindu Sculptures)*-এ ভারতের বিভিন্ন স্থানের গুরুত্বপূর্ণ ২৩টি ভাস্কর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, ভারতীয় ভাস্কর্যের মধ্যে মৌলিক অবয়ব হচ্ছে বৃত্ত। কিন্তু তিনি মনে করেন, মূল কৌশল অনেক বেশি জটিল, এই বৃত্তগুলোকে স্থানিক এবং কালিক বিভাজনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

বোনা-এর প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি। *নরসিংহ অবতার* ইলোরার বিখ্যাত ভাস্কর্যগুলোর একটি। ভাস্কর্যটি পাথর কেটে বানানো। ভাস্কর্যের মূল বিষয় ভাগবত পুরাণে বিষ্ণু এবং হিরণ্যকশিপুর মধ্যে দ্বন্দ্ব। ভাস্কর্যটির আকার মানব আকারের সমান। যেহেতু 'ভাব' প্রকাশই মূল লক্ষ্য, তাই ভাস্কর্যটির নান্দনিকতা এবং পরিপ্রেক্ষিত বেশ জটিল। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত আছে ব্রহ্মার ভক্ত হিরণ্যকশিপু এক সমৃদ্ধ রাজা। বিষ্ণুর শিষ্য হিরণ্যকশিপুর ভাইকে হত্যা করলে তিনি বিষ্ণুর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। কিন্তু বিষ্ণুর পক্ষে তাকে হত্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে,
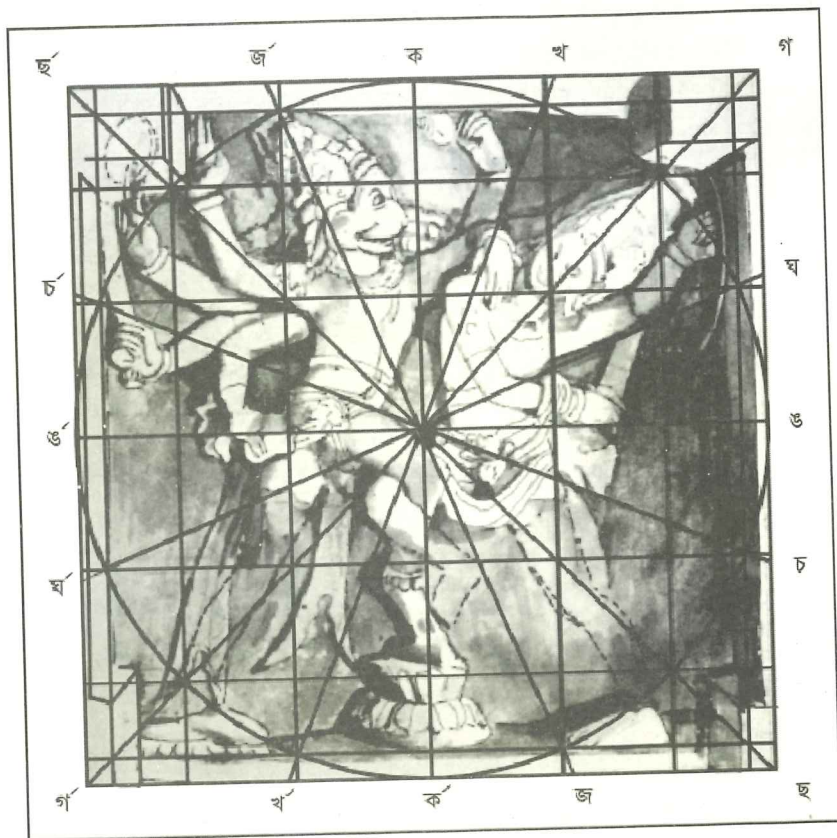
চিত্র-৮ স্থানিক বিভাজন

চিত্র-৯ কালিক বিভাজন

যেহেতু হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে অমরত্ব কামনা করলে ব্রহ্মা তাকে 'কোনো নর বা দেব হত্যা করতে পারবে না' বলে আশীর্বাদ দেন। তাই তাকে হত্যা করা মানুষ এবং দেবতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করার জন্য অর্ধেক নর এবং অর্ধেক সিংহের রূপ নেন। ভাস্কর্যটিতে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করছে কিন্তু তারা একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। প্রথম চিত্রে (চিত্র-৮) বোনা একটি স্থানিক বিভাজন করেছেন যেখানে গতি অনুপস্থিত। দ্বিতীয় চিত্রে (চিত্র-৯) কালিক বিভাজন যুক্ত করা হয়েছে। এই দুই বিষয় সমন্বয় করে শিল্পী শুভ এবং অসুরের দ্বন্দ্বের এক গতিশীল রূপ দান করেছেন। ভারতীয় দর্শনে বৃত্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। তার সাথে যুক্ত আছে পুনর্জন্ম এবং বৌদ্ধদের ভবচক্রের ধারণাও। সর্বোপরি অনেকে মনে করেন, বৃত্ত জীবনের প্রতীক। পানির ফোঁটাকে যখন দ্বিমাত্রিক উপরিতলে উপস্থাপন করা হয় তখন তা বৃত্তের আকার নেয়। অজন্তার দেয়ালচিত্রেও বৃত্তাকার পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার রয়েছে।

ভারতশিল্পে কখনো বৃত্তাকার পরিপ্রেক্ষিত, আবার কখনো বহু পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করা হয়েছে। সে কারণে ভারতশিল্পে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত অনুপস্থিত। রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত অনুপস্থিত থাকার কারণে তৎকালীন শিল্পরসিকগণ মনে করতেন তা শিল্পসম্মত নয়। কিন্তু সমস্যা তৈরি করেছিল গান্ধারের বুদ্ধের ভাস্কর্য, যেখানে অসাধারণ পরিপ্রেক্ষিত কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। তা ঔপনিবেশিক শিল্পতাত্ত্বিকদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। তখন প্রয়োজন পড়ে ভাসারির শিল্পতত্ত্বের সংযোজন বা বিয়োজনের। ফার্গুসন তা ব্যাখ্যা করেন আর্যতত্ত্ব ব্যবহার করে।

৩.৩.২. আর্যতত্ত্ব

জার্মান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলার ১৮৬১ সালে রয়েল সোসাইটিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক এক বক্তৃতায় 'আর্য জাতি' (Aryan Race) শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে লক্ষ করেছিলেন সংস্কৃত, ল্যাটিন এবং গ্রিক ভাষার কাঠামো ও শব্দগত মিল রয়েছে। তিনি এই ভাষাগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন 'ইন্দো-ইউরোপীয়ান' ভাষাগুচ্ছ হিসেবে এবং এই ভাষাগুলোর সুনির্দিষ্ট কোনো উৎস ভাষা রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। এই ভাষাভাষীদের তিনি চিহ্নিত করেছিলেন 'আর্যজাতি' হিসেবে। পরবর্তী সময়ে ম্যাক্স মুলারের ভাষাভিত্তিক 'আর্যজাতি তত্ত্ব'কে গবেষকগণ সমালোচনা করেছেন। [বিস্তারিত– Bryant & Patton, ২০০৫] এই আর্যতত্ত্ব ঔপনিবেশিক রাজনীতিসহ ইউরোপীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিকগণের কাজে মানবসমাজ, শিল্প, সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যাসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যায় 'আর্যতত্ত্ব'কে প্যারাডাইম হিসেবে গ্রহণ করাটা প্রবণতায় পরিণত হয়। শিল্পের বিকাশ এবং বিবর্তন নিয়ে ফার্গুসনের *হিস্ট্রি অফ আর্কিটেকচার ইন অল কান্ট্রিস (History of Architecture in all Countries*, 1867) তারই উদাহরণ। তিনি অন্যান্য দেশের মতো ভারতশিল্পের আর্য-অনার্য শ্রেণিকরণ করেন। ফার্গুসন এবং কানিংহামের আর্য-অনার্য শ্রেণিকরণ ও ধর্মভিত্তিক বিভাজন বঙ্গীয় পুনর্জাগরণসহ সমকালীন হিন্দুত্ব শিল্পান্দোলনেও প্রভাব রেখেছে।

কানিংহাম এবং ফার্গুসন-এর গবেষণায় এখানকার শিল্পশাস্ত্র এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। তাদের লেখা নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে ই. বি. হ্যাবেল এবং অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন, তাদের আলোচনা অনেক বেশি মাপজোক নির্ভর। পাশ্চাত্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখার কারণে তারা এ অঞ্চলের শিল্পকলার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বোপরি তাদের আলোচনায় ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা কখনো পাশ্চাত্য 'FINE ART'-এর সমকক্ষ হতে পারেনি, এবং তা শুধুমাত্র 'CRAFT' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পরবর্তীকালে জস বোরসে, জে. ডি. এস. বেগলারদের কাজে ভারতের অঙ্কনরীতি এবং অবয়ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও তাঁদের কাছেও ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা 'FINE ART'-এর মর্যাদা পায়নি।

ভারতশিল্পের ইতিহাস নির্মাণের এই রাজনীতি, বৃহত্তর ঔপনিবেশিক রাজনীতির আলোকে পাঠ করা প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক রাজনীতির অন্যতম প্রবণতা ছিল উপনিবেশিতকে অধস্তন করা। এর পরিব্যাপ্তি কেবল সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা ছড়িয়ে পড়ে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেই সময়কার ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে উপনিবেশিতকে উপস্থাপনের রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকগণ। তাদের মতে, উপনিবেশিতের কোনো জ্ঞানকাণ্ড, ইতিহাস, শিল্প, দর্শনচর্চার ইতিহাস নেই। তাই তাদের নিজেদের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা নেই। এই বয়ান তৈরির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ড তার উপনিবেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং নৈতিক বৈধতা খোঁজে। এরই অংশ হিসেবে ভারতীয় 'শিল্প'কে 'কারুকাজ' বলে চিহ্নিত করার প্রবণতার সূত্রপাত। কিন্তু উপনিবেশায়নের আরো গভীর প্রভাব রয়েছে। জ্ঞানগত উপনিবেশায়ন আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে। উপনিবেশিত নিজেদের দুর্বল এবং হীন মনে করে, যা মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের ফল। তাই উপনিবেশিত মানসিকভাবে ঔপনিবেশিক শক্তিকে যেমন গ্রহণ করে, তেমনি ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের অনুকরণকেই উন্নয়নের একমাত্র সোপান মনে করে [Bhabha, ১৯৯৪]। তখন উপনিবেশের জ্ঞানকাণ্ডকে ছেদ করার ক্ষমতা এবং সাহস উপনিবেশিতের থাকে না। আফ্রিকার বিউপনিবেশায়ন তাত্ত্বিক নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো এ প্রসঙ্গে বলেন–

> ... [T]he biggest weapon wielded and actually daily unleashed by imperialism against that collective defiance is the cultural bomb. The effect of a cultural bomb is to annihilate a people's belief in their names, in their languages, in their environment, in their heritage of struggle, in their unity, in their capacities and ultimately in themselves. It makes them see their past as one wasteland of non-achievement and it makes them want to distance themselves from that wasteland.
>
> [Thiong'o, ২০০৭: ৩]

ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড উপনিবেশিতের ইতিহাস ও বাস্তবতার যে সত্যভ্রম নির্মাণ করে তা মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ে চৈতন্যে আধিপত্য বিস্তারের ভিত্তি প্রদান করে। নগুগি চৈতন্যে আধিপত্য বিস্তারের দুটি লক্ষণের কথা এখানে বলেছেন– ১. উপনিবেশকের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে অতি মূল্যায়ন, ২. এবং তা অনুকরণ-প্রবণতা। ভারতের শিল্পচর্চায় এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

৩.৪. আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং রুচির পরিবর্তন

১৮৫৪ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস (School of Industrial Arts) প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে শিল্পকলা চর্চাকে প্রণোদনা দেয়ার উদ্দেশ্য এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়নি । ব্রিটিশ সরকারের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে রাস্তাঘাট, ইমারতসহ বিভিন্ন কাজের জন্য নকশাকার, সমীক্ষণকারী, খোদাইকার এবং লিথোগ্রাফার-এর প্রয়োজন ছিল। তাই, কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য ছিল এই প্রতিষ্ঠানের [Guha-Thakurata, ২০০৪: ১৪৩]। পরবর্তীকালে ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি সরকার অধিগ্রহণ করে এবং নতুন নামকরণ করা হয় দি গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস (The Government School of Arts)। তখন হেনরী লক অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনেন। কিন্তু তখনও ভারতশিল্পের কোনো পাঠ দেওয়া হত না। বরং গুরুত্বারোপ করা হয় ব্যবহারিক শিল্পের ওপর। উনিশ শতকে যখন জ্ঞানগত ও বস্তুগত কারণে জ্ঞানের সকল শাখার বিজ্ঞান হয়ে ওঠার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল তখন শিল্পকলাও এ প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকেনি। বাস্তব জগৎকে উপস্থাপন তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তা শিল্পের প্রগতির নির্ণায়কে পরিণত হয়। সে কারণে, আর্ট কলেজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো বাস্তববাদী শিল্পের। পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর অঙ্কনরীতি বাস্তববাদী শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মোটকথা, বাস্তববাদী পাশ্চাত্য শিল্পের শিক্ষা দেওয়া হতো এই প্রতিষ্ঠানে। ফলে, ভারতশিল্পের উপনিবেশায়নের শুরু হয়েছিল ফার্গুসন এবং কানিংহামের ভারতশিল্পের সত্যভ্রম তৈরির মধ্য দিয়ে। তা নতুন মাত্রা পায় আর্ট কলেজের পাশ্চাত্য অঙ্কনরীতি প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু, ভারতশিল্পের উপনিবেশায়নের প্রভাব শুধুমাত্র ভারতশিল্পকে 'ART'-এর মর্যাদা না দেওয়ার এবং ভারতে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার প্রভাব পড়ে সামগ্রিক জীবনে। তা সৃষ্টি করে নতুন এক সৌন্দর্য-ভাবনা। সৃষ্টি করে নতুন জীবন-কামনা। সৃষ্টি করে ঐতিহ্যকে ছেদ করে নতুন, ভিন্ন কোনো ব্যক্তি-হয়ে-ওঠার প্রবণতা, যা পরিবর্তন করেছিল রুচিবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির। এরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আর্য জাতির সূক্ষ্ম শিল্পবিষয়ক লেখায় এবং রাজা রবিবর্মার ছবিতে।

> কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে তাহার অনুবাদ করিয়া 'সূক্ষ্মশিল্প' নাম দেওয়া হইয়াছে। সৌন্দর্য প্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায়

> মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালির কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্মশিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা, বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না।
>
> [বঙ্কিম, ৪২]

বঙ্কিমের লেখা এবং রাজা রবিবর্মার (*There Comes Papa: ১৮৯৩)* ছবি আমাদের নিশ্চিত করে ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী ভারতীয় শিল্প চর্চাকে ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্নই করেনি শুধু, আমাদের রুচি-অভিরুচি জীবনভাবনা থেকেও বিচ্ছিন্ন করেছে। তারা হয়ে উঠেছে মেকলের সেই ভারতীয়, যারা দেখতে ভারতীয় কিন্তু ভাবনায় ইউরোপীয় [Macauley, ১৮৩৫], যা উপনিবেশায়নের সর্বগ্রাসী চরিত্রের নিদর্শন।
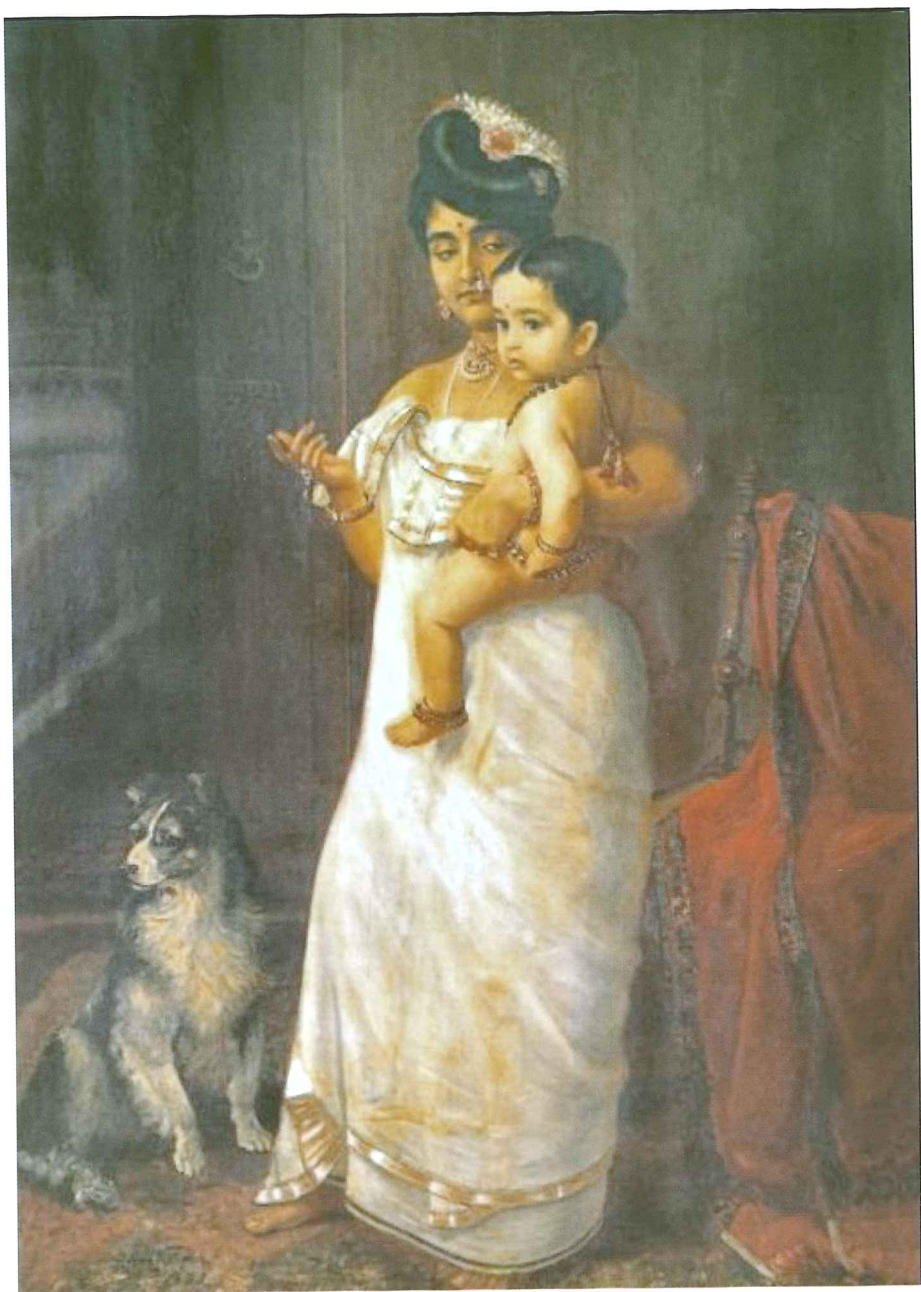
রাজা রবি বর্মা, দেয়ার কামস পাপা, তেলরং, ১৮৯৩

৪

ঔপনিবেশিক আমলে বিউপনিবেশায়ন প্রবণতা ও তৎপরতা

In India the emergency was a bruising colonialism that had become as intolerable to artists as to everyone else.

HOLLAND COTTER

উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া সচল থাকা অবস্থায়ই বিউপনিবেশায়নের তৎপরতা শুরু হয়। এই প্রতিরোধের ভিত্তি কখনো প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে হয়, কখনো হয় প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া বিপজ্জনক এবং তাতে আত্মসত্তা থেকে বিচ্ছেদের প্রবণতা থাকে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতশিল্পের যে বিউপনিবেশায়ন শুরু হয়েছে তা এখনও জারি আছে। ভারতশিল্পের ক্ষেত্রেও প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্পরীতিতে ফিরে যাবার যেমন প্রবণতা ছিল, ঠিক তেমনি রূপান্তরের প্রবণতাও বিদ্যমান ছিল। এদের মধ্যে শ্যামচরণ শ্রীমাণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দ কুমারস্বামী, ই. বি. হ্যাবেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজ উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের কাজের সামান্য ভাবনা পাওয়া কঠিন হলেও ভারতশিল্পচর্চা বিষয়ক ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তারা একমত ছিলেন না। আঠারো শতকের ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডের নতুন সংযোজিত শব্দ হল 'FINE ART'। ভারতসহ ইউরোপের বাইরের কোনো অঞ্চলেরই শিল্পচর্চা এই 'FINE ART'-এর অন্তর্গত নয়। সে বিষয়ে তাদের মত-অভিমত অভিন্ন, কিন্তু ভারতশিল্পের ভবিষ্যত বিকাশ প্রশ্নে তাদের অবস্থান ভিন্ন। জে গার্ফিল্ড সেই সময়ের প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

> The western gaze often found Indian art primitive excessive, lascivious and in general a failed aesthetic project; Indian aestheticians and artists responded to this critique in various ways. Some attempted to westernize; others sought inspiration elsewhere in Asia.
>
> [Bhushan and Garfield, ২০১১: xix]

শ্যামচরণ ও রাজা রবিবর্মা পশ্চিমা অঙ্কনরীতি অনুকরণ করার মধ্য দিয়ে ভারতশিল্পের উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করেছেন। অন্যদিকে কুমারস্বামী, হ্যাবেল এবং অবনীন্দ্রনাথ মনে করেছেন ভারতশিল্প তখনই বৈশ্বিক ইতিহাস এবং শিল্পকলায় অবদান রাখতে পারবে যখন তার ভিত্তি প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্পচৈতন্য হবে। আপাতত মনে হতে পারে, শ্যামচরণের ভারতশিল্প উন্নয়ন প্রকল্প উপনিবেশিতের বৈশ্বিক এবং আত্মসত্তার টানাপড়েনের বাইরে বের হতে পারেনি। কিন্তু ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড ভারতশিল্পকে 'সূক্ষ্ম শিল্পে'র মর্যাদা দেয়নি। তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তাদের জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে থেকে প্রতিবয়ান দাঁড় করিয়েছেন যা বিউপনিবেশায়ন তৎপরতার অংশ। তাই ভারতশিল্পের বিউপনিবেশায়ন তৎপরতার অংশ হিসেবে শ্যামচরণ, কুমারস্বামী, হ্যাবেল, অবনীন্দ্রনাথের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব এবং তার সংকট পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে– যা সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনার পরিপক্বতা বুঝতে আমাদের সহায়তা করবে।

৪.১. শ্যামচরণ

শ্যামচরণ কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন এবং আর্ট কলেজের প্রথম ভারতীয় শিক্ষক। ১৮৭৪ সালে তিনি বাংলা ভাষায় 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প' নামে ছোট একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এটা ছিল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম শিল্পবিষয়ক রচনা। যদিও রচনাটি কালের গহ্বরে হারিয়ে যায় কিন্তু বিউপনিবেশায়ন বিষয়ক আলোচনায় তার গুরুত্ব রয়েছে। শ্যামচরণ মূলধারার ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে ভারতশিল্পের ইতিহাস রচনা করেন এবং প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন যে পাশ্চাত্যের মতো ভারতীয় ভাস্কর্য, চিত্র ও স্থাপত্যও সূক্ষ্ম শিল্পের দাবিদার। যদিও পাশ্চাত্যের শিল্প সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু ভারতশিল্প হয়নি। শ্যামচরণ ভারতশিল্পের ইতিহাস রচনায় জেমস ফার্গুসনের *হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান এন্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার* (*History of Indian and Eastern Architecture)* এবং হেনরী কলের *ক্যাটালগ অফ দি অব্জেক্টস অফ ইন্ডিয়ান আর্ট এক্সিবিটেড ইন দি সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম* (*Catalogue of the objects of Indian Art Exhibited in the South Kensington Museum)* বইয়ের ওপর নির্ভর করেছেন। তপতি গুহ ঠাকুরতা হেনরী কলের বইকে 'The very first history of Indian art' [Guha-Thakurata, ২০০৪: ১৪৫] হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফার্গুসন এবং কলের গবেষণা পদ্ধতি মুলারের 'আর্যজাতি তত্ত্ব' এবং জার্মান ঐতিহাসিক ভিকেলমানের শিল্পকলার বিবর্তনতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সে কারণে শ্যামচরণের লেখা আর্যজাতি তত্ত্ব এবং শিল্পকলার বিবর্তনবাদের দ্বারা শুধু প্রভাবিতই ছিল না, তিনি এই দুই তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করেন, আর্যদের হাত ধরে ভারতে শিল্পচর্চা এসেছে এবং তাদের ভাস্কর্য, চিত্র ও স্থাপত্যই শুধু 'সূক্ষ্ম শিল্প'। সেই চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় মুসলমানদের আগমনের আগ পর্যন্ত। ফার্গুসনসহ অন্যদের কাছে কারা আর্যজাতি– এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকলেও তিনি বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণদের আর্যজাতি বলে চিহ্নিত করেন। একই সাথে তিনি মনে করেন, পাশ্চাত্যের শিল্পধারা বিকাশমান কিন্তু আমাদের শিল্পধারা নিম্নগামী। তার মতে, কালিঘাটের পটচিত্র এবং বটতলার চিত্র প্রাচীন আর্যশিল্পের বিকৃত রূপ, যেমন— যাত্রা হল প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বিকৃত রূপ।

শ্যামচরণের লেখায় ধরা দিয়েছে সমৃদ্ধশালী অতীত এবং বিপর্যস্ত বর্তমান। বিপর্যস্ত বর্তমান থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন পাশ্চাত্যের অনুকরণ। ১৮৬৯ সালে হিন্দু মেলায় ভারতীয় শিল্পীদের চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী হয়। সেখানে

তিনি নবীনদের ভারতশিল্পের প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান এবং তা করতে বলেন পাশ্চাত্যের অনুকরণের মধ্য দিয়ে। কলকাতার ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব গ্রহণের পেছনে আধুনিক হয়ে ওঠাই একমাত্র কারণ এমনটা ভাবা ভুল হবে, বৈষয়িক কারণও সেখানে ছিল। কলকাতার অর্থনীতি, মধ্যবিত্তের জীবন এবং জীবিকা অনেকাংশে ব্রিটিশ সরকারের চাকুরিনির্ভর ছিল। তাই, ব্যবহারিক শিল্পের নামে ড্রয়িং, মানচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল তার বৈষয়িক তাগিদ উপেক্ষা করা শ্যামচরণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তপতী গুহ, শ্যামচরণের উন্নয়ন ভাবনা প্রসঙ্গে বলেন, 'While India's past figured as a source of pride and autonomy, the present incited a desire or self-improvement and progress on the colonial model.[Guha-Thakurata, ২০০৪: ৩]। শ্যামচরণের আধুনিকতা, প্রগতি এবং ঐতিহ্যবিষয়ক ভাবনা উনিশ শতকের সাহিত্যিক, দার্শনিকসহ অনেকের চিন্তায় দেখা যায়। সেই সময়কার দার্শনিক অরবিন্দ ঘোষ বলেন–

> India can best develop herself and serve humanity by being herself...This does not mean, as some blindly and narrowly suppose, the rejection of everything new that comes to us ....[that] happens to have been first developed or powerfully expressed by the West. Such an attitude would be intellectually absurd, physically impossible, and above all unspiritual; true spirituality rejects no new light, no added means or materials of our human self-development. It means simply to keep our center .... and assimilate to it all we receive, and evolve out of it all we do and create.
>
> [Aurobindo, ১৯১৮: ৬৪]

কুমারস্বামী, অরবিন্দের এই ভাবনাকে সমালোচনা করে বলেন, অরবিন্দ বুঝতেই পারেননি পাশ্চাত্য আমাদের ভাবনার কেন্দ্রই পাল্টে দিয়েছে। শ্যামচরণের লেখার সাথে কুমারস্বামী হয়তো পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু পরিচিত হলে সম্ভবত কুমারস্বামী শ্যামচরণের লেখারও একই সমালোচনা করতেন।

শ্যামচরণ ভারতশিল্পের উপস্থাপনের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং এর প্রতিবয়ান উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তার উন্নয়ন পরিকল্পনা উপনিবেশায়নের বৃহৎ রাজনীতির গহ্বরে পতিত হয়। শ্যামচরণের বইয়ের ভূমিকায় লক লেখেন–

> The very fact that you have attempted to engage the attention of those of your countrymen to whom the vernacular is the only vehicle for knowledge, and through their mother tongue to

teach somewhat ... of the admirable Art of your forefathers should to my mind secure for you the very hearty commendation of all who are interested in the spread of Art-knowledge in India.

[উদ্ধৃত হয়েছে– Guha-Thakurata, ২০০৪: ১৪১-১৪২]

লকের দৃষ্টিতে শ্যামচরণ সেই ভারতীয়দের একজন– যাদের চৈতন্য ইউরোপীয় কিন্তু দেখতে ভারতীয়। টমাস মেকলে মনে করতেন, শ্যামচরণের মত লোক ইংরেজদের চিন্তাকে কোটি কোটি ভারতীয়দের কাছে পৌঁছে দেবে [Macauley, ১৮৩৫][৯]। শ্যামচরণের উন্নয়ন প্রকল্প উপনিবেশিত কিন্তু তাতে ভারতশিল্পের ইতিহাস বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিউনিবেশায়নের প্রবণতা বিদ্যমান।

৪.২. হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ: উপনিবেশিত ভারতের আত্মপরিচয় নির্মাণের আখ্যান

আঠারো শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশদের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ ও কলকাতার আর্ট কলেজ। এই সকল কলেজে ব্রিটিশ সিলেবাস পঠনের কারণে ছাত্ররা পাশ্চাত্যের অঙ্কনরীতি ও টেকনিক আত্মস্থ করতে থাকে। ফলে তারা দেশজ অঙ্কনরীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। সর্বোপরি শ্যামচরণ, চারুচন্দ্র নাগের লেখার কারণে এ অঞ্চলের নন্দনভাবনা এবং রুচির পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উপনিবেশায়নের প্রভাব শুধুমাত্র বিষয়বস্তু চয়নে সীমাবদ্ধ থাকে না। হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন পাশ্চাত্য শিল্পরীতি অনুকরণের মধ্য দিয়ে ভারতশিল্প বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অবনীন্দ্রনাথ বলেন–

> আর্ট স্কুলে প্রাচীন গ্রিক রোমানমূর্তির মাটির ছাঁচ এবং ইউরোপীয় চিত্রকলার মাঝারি গোছের সস্তা নমুনা থেকে নকল নিয়ে নিয়ে আমাদের দেশে শিল্প-শিক্ষার্থীদের করে তোলা হচ্ছে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অয়েল পেইন্টার, ওয়াটার কালার পেইন্টার, নকল র‍্যাফেল, টিশিয়ান হয়ে উঠবার অভিনয় চলছে, যেন বাঙালি ছেলে ব্রুটাস সেজে মুখস্থ করা স্পীচ আউড়ে যাচ্ছে আর ভাবছে নিজেকে সত্যই রোমান সেনেটর একজন।
>
> [অবনীন্দ্রনাথ, ২০১২(২): ১৭৪]

---

[৯] '... to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.' [Macauley, ১৮৩৫]

হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, ভারতীয় শিল্পীদের বিশ্বশিল্পে অবদান রাখতে হলে তাদের প্রাক-ঔপনিবেশিক অঙ্কনরীতি অনুসরণ করতে হবে। হ্যাবেল ১৮৮৬ সালে কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। সেই সময় থেকে তিনি মনে করতেন, ভারতের শিল্পচর্চার ধারা পশ্চিমা ধারা থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু তিনি তা তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারছিলেন না। সে সময়ে সুস্পষ্ট হয়নি কীভাবে ভারতের চিত্রকৌশল ও পদ্ধতি পাশ্চাত্য থেকে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। এই উত্তর আসে অবনীন্দ্রনাথের ১৯০৯ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে হ্যাবেলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত 'ভারতশিল্প' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ থেকে।

কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভারতশিল্পের পাঠ শুধুমাত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক আগ্রহের বিষয় ছিল না। তার সাথে যুক্ত ছিল উপনিবেশের প্রতিরোধ ও জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ। 'ভারতশিল্প' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ভারতের শিল্প-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছেন। একই সাথে তিনি আধুনিকতা এবং প্রগতির মাঝে আটকে পড়া শ্যামচরণ এবং চারুচন্দ্র নাগের উন্নয়ন প্রকল্পের থেকে ভিন্ন প্রস্তাব দেন। অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রাচ্যতত্ত্বের মধ্যে থেকেই জাতীয় শিল্পকলার চরিত্র অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই শুধু ভারতশিল্পের উন্নয়ন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে কুমারস্বামী মনে করেন, প্রয়োজন বোধে পাশ্চাত্য আধিপত্যশীল জ্ঞানকাণ্ড এবং ক্ষমতা প্রতিরোধের জন্য প্রাচ্যবাদ থেকেও গ্রহণ করা বা নেওয়া উচিত। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের অবস্থান ভিন্ন। তিনি মনে করেন শিল্পকলার জাতীয় চরিত্র রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সব মানুষ এক রকম নয়; এক এক জাত এক এক রকম খাচ্ছে, পরছে, চলছে এবং ভাবছেও, এক এক জাতির বাহিরের চালচোল রকম-সকম এবং জাতির অন্তরের ভাবনা-চিন্তা দুইয়ের মিশে উৎপন্ন হয় শিল্পের মধ্যে দেশীয় জাতীয়তা।' [অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৫: ১৭১]

আধুনিকতাকে স্থান-কাল-পাত্রনির্ভরশীল নয় বলে ভাবা হয়। কিন্তু উত্তর-আধুনিকতাবাদ আমাদের বুঝতে সহায়তা করেছে যে, আধুনিকতা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি থেকে বিকশিত এবং আবর্তিত। তা সব সমাজ এবং সময়ের সর্বজনীন অভিব্যক্তি নয়। শ্যামচরণ যে আধুনিকতাকে সার্বিক এবং সর্বজনীনভাবে গ্রহণ করেছেন, অবনীন্দ্রনাথ তাকে চিহ্নিত করেছেন স্থানিক এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে। একই সাথে তিনি মনে করেন ভারতীয় শিল্পচর্চারও সার্বিক চরিত্র রয়েছে। এই চরিত্র অনুসন্ধানের অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছেন জাপানি শিল্পরসিক এবং ঐতিহাসিক কাকুঝো ওকাকুরা-এর ১৯০৩ সালে প্রকাশিত *দি আইডিয়ালস অফ দি ইস্ট* (*The Ideals of the East*) গ্রন্থ থেকে।

ওকাকুরার সাথে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল এবং তিনি কিছুকাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ছিলেন। এই গ্রন্থের আপন (নিজ) ও অপরের পরিচয় নির্মাণের রাজনীতি এবং প্রাচ্যবাদের তত্ত্ব নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে প্রাচ্যের পরিচয় 'নিম্নগামী জাতিগোষ্ঠী', যাদের সুউজ্জ্বল অতীত ছিল। কিন্তু ওকাকুরা তার বইয়ে প্রাচ্যের শিল্পের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। তিনি উপস্থাপন করেন, প্রাচ্য কোনো নিম্নগামী সভ্যতা নয়; বরং তা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞায় পূর্ণ প্রবাহমান সভ্যতা। আধ্যাত্মিকতাই হওয়া উচিত পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী-ভোগবাদী সংস্কৃতিকে প্রতিরোধের ভিত্তি। ভোগবাদী-বস্তুবাদী সংস্কৃতি রেনেসাঁ–উত্তর ইউরোপের জীবন ও সংস্কৃতিকে গভীর সংকটে নিয়ে যায়। তাই হ্যাবেল মনে করেন, এই আধ্যাত্মিকতাই প্রাচ্যের সক্রিয় টিকে থাকার ভিত্তি [Havell, ১৯২০]।

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণি জীবন এবং জীবিকার তাগিদে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে এখানকার সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একই সাথে শহর ও গ্রামের সাংস্কৃতিক দূরত্বের কারণে হাজার বছরের প্রবহমান লোকজ সংস্কৃতি থেকেও বিচ্ছিন্ন। কিন্তু জাপানের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। তাদের প্রতিনিধিত্বশীল মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির সাথে লোকজ সংস্কৃতির দূরত্ব কম থাকার কারণে তারা প্রবহমান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ফলে মূলধারার সংস্কৃতি প্রাচীন জাপানের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার কারণে পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা প্রবহমান সংস্কৃতির মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাই ওকাকুরা ভেবেছেন জাপানের 'আধ্যাত্মিকতা' পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করার ভিত্তি হতে পারে। কিন্তু কলকাতার প্রতিনিধিত্বশীল অংশ তার লোকজ এবং প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে অবনীন্দ্রনাথ ভেবেছেন, 'আধ্যাত্মিকতা'কে ভিত্তি করেই আমরা প্রাক-ঔপনিবেশিক চৈতন্যে ফিরে যেতে পারি। আর সে কারণে জাপানের কাছে আধ্যাত্মিকতা পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হলেও তা কলকাতার পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁর ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় অবনীন্দ্রনাথ এবং হ্যাবেল ভারতশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে আধ্যাত্মিকতাকে চিহ্নিত করেন। হ্যাবেল বলেন–

> ....[T]he artistic ideal of the human or divine figure, expressing spiritual instead of physical strength, which Indian sculptors and painters inspired by Aryan philosophy gradually evolved out of the eclectic elements of the transition period. It was an ideal common to all schools of religious thought Jain,

Buddhist, or Brahmanical. The Jains adapted it to their Tirthankaras, the Buddhists to their Buddhas and Bodhisattvas, and the orthodox Brahmanical sects to the divinities of their own pantheon: for, in spite of the diversity of sects, there is a common spiritual basis to all Indian art and religion.

[Havell, ১৯২০: ৪৮]

সে কারণে শ্যামচরণের মতে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্প, যা সময়ের সাথে সাথে অবনতির দিকে গেছে। তার মতে, গান্ধারের শিল্পের বিকৃত রূপ কালিঘাটের পটচিত্র; সংস্কৃত সাহিত্যের বিকৃত রূপ পুথি এবং সংস্কৃত নাটকের বিকৃত রূপ যাত্রা। অবনীন্দ্রনাথের কাছে পুনর্জাগরণের ভিত্তি সেই বটতলা বা কালিঘাটের পটচিত্র অথবা রাজপুত বা মুঘল চিত্রকলা।

এখানে উল্লেখ্য, পাশ্চাত্যের জ্ঞানকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের আবর্তন। তিনি পাশ্চাত্যের আর্য-অনার্য তত্ত্বে যেমন বিশ্বাস করতেন, ঠিক তেমনি তার চিন্তায় বিবর্তন তত্ত্বের প্রভাব ছিল—

জীবতত্ত্ববিদ যাঁরা, তাঁরা মানুষের জাতি বিভাগ করেছেন মুখাকৃতি ও দৈহিক মাপজোখ দিয়ে। তাঁরা কাউকে বলেছেন আর্য, কাউকে অনার্য, সেদিক থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, আর্যজাতি এসে ভারতবর্ষে অনার্যদের মধ্যে বসতি করলেন এবং অনার্যদের ক্রমে সকল দিক দিয়ে জয় করে আর্যাবর্ত বলে প্রকাণ্ড একটা রাজত্ব স্থাপন করলেন। এ ঘটনার অনুরূপ ঘটনা আজও ঘটেছে। দেখব আজকের মিশনারীরা একইভাবে আফ্রিকা, ফিজি প্রভৃতি জায়গায় ধর্মবল এবং বাহুবল নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে অকর্মা ও অন্যকর্মাদের মধ্যে। শুধু এই নয়, অপেক্ষাকৃত সুসভ্য কিন্তু অন্যব্রত অথচ একই আর্যজাতি তাদের মধ্যেও পশ্চিমের আর্য সভ্যতার দূত সমস্ত নানাভাবে নানান ক্রিয়া করে চলেছে আজকের ভারতবর্ষে। এছাড়া আকৃতির হিসেবে দেখছি আর্য ছাঁচের মানুষ, কিন্তু বৃত্তির হিসেবে দেখছি রাক্ষস বা দস্যু এবং বুদ্ধির হিসেবে একেবারে বর্বর। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পৃথিবীজোড়া আর্যদের মধ্যে আজও ছড়ানো দেখতে পাই। সুতরাং যদি বলি ভারতের মধ্যে একটা জাতি আর্যব্রত, অন্যব্রত এবং অকর্মা- এই তিন থাকে বিভক্ত ছিল ভারতশিল্পের উৎকর্ষের শৈশবাবস্থায়, তবে একেবারে যে অসঙ্গত কল্পনা করা হল তা নয়।

[অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৫: ২৩২]

অবনীন্দ্রনাথ, শ্যামচরণের মতো মনে করতেন, হিন্দু এবং আর্য সমার্থক। একই সাথে অন্যব্রত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, খ্রিস্টান এবং হিন্দু আর্য হলেও তারা অন্যব্রত

[অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৫: ৩২১]। একই লেখায় তিনি এখানকার আদিবাসীদের অকর্মা বলে চিহ্নিত করেছেন, যারা পাশ্চাত্য ভদ্রলোক হওয়ার শর্ত পূরণ করে না। যারা এই সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠী, তিনি তাদেরও অকর্মা বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই তার ভাষায় এলাকার মেহনতি মানুষ 'অকর্মা' বলেছেন। একই বয়ান পাশ্চাত্য উপস্থাপন করেছে উপনিবেশিতের প্রসঙ্গে।

অবনীন্দ্রনাথ নিজেও শিল্পী ছিলেন। হ্যাবেল এবং কুমারস্বামীর মতো শুধু তাত্ত্বিক ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথের *ভারতমাতা* (১৯০৬) বিখ্যাত একটি ছবি, যা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়। *ভারতমাতায়* তিনি লক্ষ্মীর চার হাতে শিল্প, ধর্ম, সম্পদ এবং জ্ঞানের প্রতীক উপস্থাপন করেছেন। এই ছবিতে একাধারে যেমন আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া রয়েছে, তেমনি রয়েছে কলকাতার সমাজে সক্রিয় পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য ধারণার বলয়কে ছেদ করার স্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা। তাই, *ভারতমাতাকে* উপস্থাপন করেছেন করুণাময়ী-রক্ষণশীল এক নারী রূপে। কলকাতার সমাজের আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, রুচির যে বিকৃতি ঘটেছিল তা থেকে বের হতে চেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কলকাতার সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটেছে। একক পরিবার গঠন হওয়ার কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গভীরতা বেড়েছে, বেড়েছিল নির্ভরশীলতাও। স্ত্রীর কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র সাংসারিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে না থেকে সামাজিক কলেবরে তার বিস্তার ঘটেছিল পার্টি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে। ফলে, তখন 'মেমসাহেব' হয়ে উঠলেন প্রত্যাশিত স্ত্রী। তরুণ প্রজন্মের কামনা 'মেমসাহেব'। অবনীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তিত রুচির পরিবর্তন করার জন্য লক্ষ্মীর রূপ দিয়েছেন মমতাময়ী, নমনীয়, রক্ষাকারী এক আধ্যাত্মিক রূপে।

আধ্যাত্মিকতা আমাদের সভ্যতার মূল ভিত্তি নয়। এই সভ্যতার ভিত্তি উৎপাদন ব্যবস্থা। গ্রামের প্রান্তিক নর-নারীর উৎপাদনমুখর জীবন, যা সুলতানের আলোচ্য বিষয়। অবনীন্দ্রনাথের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব প্রাচ্যবাদ, আর্য-অনার্য তত্ত্ব এবং বিবর্তনবাদ নির্ভর একটি বয়ান, যা আমাদের আত্মসত্তার মূল ভিত্তি নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতমাতা, জলরং, ১৯০৫

ঢাকার শিল্পচর্চার প্রবণতা

আমরা পৃথিবীর সব ভালো গ্রহণ করবো। কিন্তু এই গ্রহণ করা কোনভাবেই অজ্ঞান হয়ে নয়। বরং নিজের সত্যকে জেনেই আমরা গ্রহণ করবো। নিজের পরিবেশকে মেনে নিয়েই আহরণ করবো আমাদের এই পরম সঞ্চয়।

জয়নুল আবেদিন

জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), সুলতান, কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮) ঢাকাকেন্দ্রিক শিল্পচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ এবং অগ্রজ। ১৯৪৮ সালে ঢাকা চারুকলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার শুরু। জয়নুল এবং কামরুলসহ আরো অনেকেরই চারুকলা প্রতিষ্ঠা ও চর্চায় মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। তারা সকলেই শিল্পকলার পাঠ নেন কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজে। সে সময় কলকাতায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন যেমন চলছে, তেমনি আধুনিকতা এবং পুনর্জাগরণবাদের চরম দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। এ অবস্থার মধ্য দিয়েই তাদের শিল্পচৈতন্য নির্মিত হয়েছে। ছাত্রজীবনে তাদের কাজের বিষয়বস্তু শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল না। বরং বিষয়বস্তু ছিল শহর এবং শহরের বাহিরে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং গ্রামীণ নিসর্গ। বিষয়বস্তু চয়নে পুনর্জাগরণবাদের প্রভাব ছিল, কিন্তু উপস্থাপনা এবং অঙ্কনরীতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ছিল বেশি। কিন্তু ১৯৪৭-এর পর থেকে ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিউপনিবেশায়ন তৎপরতা কমতে থাকে। তার তিনটি কারণ ছিল– ১. মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রভাব, ২. মার্কসীয় রাজনীতির প্রভাব এবং ৩. ঢাকার শিল্পীদের বিদেশ গমন।

৫.১. মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রভাব

১৯৪৭-এর পর আধুনিকতা এবং পুনর্জাগরণবাদের দ্বন্দ্ব ঢাকায় এক নতুন মাত্রা পায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের পৃথক অভিব্যক্তি অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষায়। তখন বাঙালি মুসলমানের ধর্ম, আত্মপরিচয় এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে সম্পর্ক নতুন করে মীমাংসার প্রয়োজন হয়। ফলে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পাকিস্তান আমলে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পচর্চা এর বাহিরে থাকতে পারে না। এই আত্মপরিচয়ের সংকটের কারণে বাঙালি মুসলমান শিল্পী কখনো অনুপ্রেরণা খুঁজেছে নিজেদের ইতিহাসের মধ্যে, কখনো আবার খুঁজেছে ভারতবর্ষের বাইরে মধ্যপ্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্যে। বিশেষত, পাশ্চাত্য আমাদের শিল্প আন্দোলনকে এসময় পুনরায় গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষাও কমে আসে। তা স্পষ্ট হয় জয়নুলের লেখা থেকে–

> আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি অনেক পুরানো। বহু শতাব্দীর প্রাচীন এ সংস্কৃতি এবং আমাদের সংস্কৃতিকে যথার্থ অর্থে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য প্রয়োজন নিজের দেশ ও মাটির সত্যিকার চেতনার সাথে একাত্ম হওয়া। এ জন্য আমরা পৃথিবীর সবকিছু ভালো গ্রহণ করবো। কিন্তু এই গ্রহণ করা কোনভাবেই অজ্ঞান হয়ে

> নয়। বরং নিজের সত্যকে জেনেই আমরা গ্রহণ করবো। নিজের পরিবেশকে মেনে নিয়েই আহরণ করবো আমাদের এই পরম সঞ্চয়। তা যদি না করি তাহলে আমরা হারিয়ে যাবো, হারিয়ে যাবো কৃত্রিম এক জীবনের অতল অন্ধকারে।
>
> [উদ্ধৃত হয়েছে– তাহের, ২০০৮ : ৫১]

শ্যামচরণের প্রায় একশত বছর পর উপনিবেশোত্তর পর্বে জয়নুল এবং অরবিন্দ-এর ভাবনার মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্যামচরণ এবং অরবিন্দর ভাবনা ব্রিটিশ শাসনকালে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয়, ধর্ম, আধুনিকতা এবং প্রগতির প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তানে যে সুরাহা হয়নি এখানে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তখন থেকেই বঙ্গীয় শিল্প ধারার সাথে ঢাকার শিল্পচর্চার বিচ্ছেদ করার প্রবণতা প্রবল হয়। [তাহের, ২০০৮: ২৫; নজরুল, ২০০৩: ২৯, ৩৩]।

৫.২. মার্কসীয় রাজনীতির প্রভাব

সে সময় বঙ্গীয় শিল্প ধারার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানোর একমাত্র কারণ সদ্য জন্ম-হওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলিম জাতীয়তাবাদ নয়, বরং মার্কসীয় রাজনীতিও একটি বড় কারণ। মার্কসীয় দর্শন পুনর্জাগরণবাদ এবং প্রাচ্যবাদের দার্শনিক ভিত্তিকে খানিকটা দুর্বল করে দেয়। ফলে পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। পঞ্চাশের দশকে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'ঢাকা আর্ট স্কুল'। যেখানে শিল্পীদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন মার্কসীয় বুদ্ধিজীবীরা; তাদের মধ্যে অন্যতম সরদার ফজলুল করিম, অজিত কুমার গুহ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ [তাহের, ২০০৮: ২৪; নজরুল, ২০০৩: ২০]। ঢাকা আর্ট গ্রুপের মার্কসীয় চিন্তকদের সাথে ভাবনার আদান-প্রদানের কারণে পূর্ব-পশ্চিমের পৃথকীকরণে আগ্রহ কমতে থাকে। মার্কসীয় দর্শনে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিরোধকে কোনো মৌলিক বিরোধ বলে মনে না করার কারণে বঙ্গীয় শিল্প ধারার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া, হ্যাবেল এবং অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভাবনির্ভর ভারতীয় শিল্পকলার উপজীব্য আধ্যাত্মিকতা এবং অধিবিদ্যা, যা মার্কসীয় দৃষ্টিতে খারিজযোগ্য। বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে যথার্থ শিল্পতত্ত্ব বাস্তববাদ, যা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিগত একশত বছর ধরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ফলে, পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর অঙ্কনরীতির কদর এবং সমাদর বাড়তে থাকে ঢাকায়। জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি তারই উদাহরণ। তাই জয়নুল দ্বিধাহীনভাবে বলেন, 'রেনেসাঁর পর থেকে ইউরোপীয় যত শিল্প-আন্দোলন ঘটেছে সব হয়েছে সজ্ঞানে এবং

সেটা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি চাই আমাদের শিল্পীরা নিজের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে যেন কাজ করে। বিদেশি আঙ্গিকের গ্রহণ দূষণীয় নয়।' [তাহের, ২০০৮: ৫১]।

৫.৩. বিদেশ গমনের প্রভাব

১৯৫৮ সালের পর থেকে ঢাকার অনেক শিল্পী বৃত্তির টাকায় পড়তে যান ইউরোপে এবং জাপানে। তাদের মধ্যে হামিদুর রহমান শিক্ষা লাভ করেন লন্ডনে, রশীদ চৌধুরী স্পেন ও ফ্রান্সে, আমিনুল ইসলাম ও মুর্তজা বশীর ইতালি, আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল বাসেত আমেরিকায়, মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপান এবং সফিউদ্দিন আহমেদ লন্ডনে [তাহের, ২০০৮: ২৬]। সে সময় ঢাকার শিল্পীরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পাশ্চাত্যের শিল্প-আন্দোলনের সাথে পরিচিতি হন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে। আঙ্গিকগত দিক থেকে অনুকরণের প্রবণতা শুরু হয়। তখন প্রতিচ্ছায়াবাদ, অভিব্যক্তিবাদ (Expressionism), পরাবাস্তববাদ (Surrealism), বিমূর্তবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার চর্চা লক্ষ করা যায়। এই বিষয়ে মোহাম্মদ কিবরিয়া বলেন, 'উন্নত দেশগুলোতে যেসব শিল্পী শিক্ষা গ্রহণ করতে যায় এবং ছাত্র হিসেবে তারা যে শিক্ষা নিয়ে আসে তাতে শুধু শিল্পচর্চায়ই নয়, স্থাপত্য ও জীবনযাত্রার প্রতি ক্ষেত্রেও নতুন শিক্ষা নিয়ে আসে। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার থেকে শিল্পী বিচ্ছিন্ন নয়। শিল্পীর যা ভালো লাগে তা সেখান থেকে নেয়। এটা দোষের কিছু নয়। এই ষাটের দশকের শিল্পচর্চা ও শিক্ষাদানের ভাল দিক হচ্ছে পাশ্চাত্য শিল্পের কলাকৌশল এবং দেশের কী ভালো দিক আছে তা বোঝা সম্ভব হয়েছে।' [তাহের, ২০০৮: ২৭]। আবু তাহের ঢাকায় শিল্পচর্চার বিভিন্ন প্রবণতা নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, 'আসলে আমাদের লোকচর্চায় অন্তর্নিহিত বিষয়টাকে দু-একজন ব্যতিরেকে অনেকেই ভালোভাবে উপলব্ধি করে ব্যবহার করতে পারেনি। আবার পাশাপাশি কয়েকজন চিত্রশিল্পীর কিছু কিছু কাজে এতো বেশি পাশ্চাত্য ঢঙ ও রীতির প্রয়োগ ঘটেছে তাতে করে জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে।' [তাহের, ২০০৮: ২৭]।

এক কথায় বলা চলে, এই মূলধারা আঙ্গিকগত দিক থেকে আধুনিকতার নামে সম্পূর্ণ অর্থে পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। প্রারম্ভে ঢাকা আর্ট গ্রুপ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ এবং মুসলমানের আত্মপরিচয়ে সংকটের মধ্যে থাকায় বাঙালি জীবনের বয়ান সেখানে ছিল অনুপস্থিত। পরবর্তী সময়ে, ১৯৫২-এর ভাষা

আন্দোলনের পর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে পোস্টার ও আলপনা আঁকা ছিল বাঙালি সংস্কৃতির একমাত্র প্রকাশ। কিন্তু বিষয়বস্তুগত দিক থেকে স্বকীয়তা প্রকাশিত হয় মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে।

সুলতানের ভাবনা, অঙ্কনরীতি এবং বিষয়বস্তু চয়নের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা ছিল। তিনি এদেশে ইউরোপীয় শিল্পচর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সন্দিহান ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিদেশিদের কাছ থেকে আমরা কত সাহায্য পাচ্ছি সেটা বড় কথা নয়; আমাদের দেশের মানুষের মানসিক উন্নতি ঘটেনি। নান্দনিক জ্ঞানের উন্নতি হয়নি, হয়েছে অবক্ষয়।' [তাহের, ২০০৮: ৮৯] এ থেকে সুলতানের বিউপনিবেশায়ন এবং শিল্পভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৬

সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা

একেষামেব তদ্ রম্যং লগ্ণং যত্রচ যস্য হৃৎ।
শাস্ত্রমানবিহীনং যদ্ রম্যাং তদবিপপশ্চিতাম্ ॥

শুক্রাচার্য

১৯১৪ সালে অবনীন্দ্রনাথ প্রবাসী পত্রিকায় 'মূর্তি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যা ১৯৪৮ সালে *ভারতশিল্পে মূর্তি* শিরোনামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। বইয়ের ভূমিকায় তিনি বারবার সতর্ক করেছিলেন শাস্ত্রীয় মাপজোক শিল্পীর জন্য নয়। এ প্রসঙ্গে ভূমিকার শেষাংশে তিনি শুক্রাচার্যের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। শুক্রাচার্যের স্বগত বয়ান থেকে জানা যায়– একদিন সৌন্দর্যলক্ষ্মী এক অজ্ঞাত শিল্পীর মূর্তিতে ধরা দিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন শুক্রাচার্যের কাছে। অজ্ঞাত শিল্পীর মূর্তি শাস্ত্রনির্ভর ছিল না। সৌন্দর্যলক্ষ্মী শুক্রাচার্যকে বলেন– 'আমাকে দেখ!!' তিনি দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন শাস্ত্রের মাঝে সৌন্দর্যকে আবদ্ধ করা যায় না। শিল্প শাস্ত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। শিল্প অভিভূত করে। উদ্ভাসিত করে। সুলতানের শিল্পকর্ম শাস্ত্রীয় নয়। সম্ভবত সে কারণে আহমদ ছফা ভেবেছেন ভারতশিল্পের হ্যাবেলীয় সংজ্ঞা ছাড়িয়ে গেছেন সুলতান। কিন্তু তা সঠিক নয়। শুধু অভিমুখিতা বিবেচনায় সুলতানের শিল্প এবং ভারতশিল্প অভিন্ন, তা নয়, বরং কৌশল প্রশ্নে হ্যাবেলীয় শর্ত তার শিল্পকর্মে বর্তমান। এই অধ্যায়ে সুলতানের চিত্রের বিষয়বস্তু, অঙ্কনরীতি এবং উপকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১. বিষয়বস্তু

সুলতানের চিন্তার ক্ষেত্রভূমি ঢাকার শিল্পচর্চা, কলকাতার পুনর্জাগরণবাদ এবং ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পকলা। তার ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতা আর্ট কলেজে। তিনি পঞ্চাশের দশকে দেশে ফেরার আগে কিছুকাল আমেরিকায় এবং লন্ডনে ছিলেন। তার সে সময়কার ইউরোপীয় প্রতিচ্ছায়াবাদী ধাঁচে আঁকা ছবিগুলো পিকাসো, দালিদের সাথে প্রদর্শিত হয়েছে, যা থেকে ধারণা করা যায়, তিনি পাশ্চাত্য অঙ্কনরীতিতে সিদ্ধ হয়েছিলেন। সর্বোপরি পঞ্চাশের দশকের পর থেকে বাংলাদেশে থাকার ফলে বাংলাদেশের শিল্পচর্চার আত্মপরিচয়ের সংকটের বিষয়ে অবগত ছিলেন। সে কারণে সুলতানের ভাবনাক্ষেত্র হল সদ্য স্বাধীন-হওয়া বাংলাদেশের আত্মপরিচয়, আধুনিকতা এবং প্রগতির মধ্যে আটকে পড়া ঢাকার শিল্পচর্চার সংকট এবং বৈশ্বিকতার নামে হাজির পাশ্চাত্য শিল্পকলা। এই সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়েই তার বাংলাদেশের শিল্পকলার বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব, যা পরিণত বয়সে সুলতানের শিল্পচৈতন্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। এর প্রভাব লক্ষ করা যায় বিষয়বস্তু, অঙ্কনরীতি এবং উপকরণ ব্যবহারে। নৃতাত্ত্বিক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর মনে করেন, সুলতানের বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব অনেকাংশ পুনরাবৃত্তিক, বিশেষ করে 'চিত্রগত সমস্যার ক্ষেত্রে তার সমাধান

পুনরাবৃত্তিক, সে জন্য তাকে মনে হয় গ্রাম্য, সরল' [মনজুরুল ও সুবীর, ১৯৯৫: ২৩]। তার বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব বঙ্গীয় পুনর্জাগরণবাদ থেকে স্বতন্ত্র এবং তিনি অঙ্কনরীতির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা নিয়েছেন প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্পরীতি থেকে। কিন্তু তিনি প্রাক-ঔপনিবেশিক চিত্ররীতিতে ফিরে যাননি, বরং তিনি প্রাক-ঔপনিবেশিক চিত্ররীতির সৃষ্টিশীল বৈশ্বিক রূপান্তর ঘটিয়েছেন। একই সাথে তার বিষয়বস্তু ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাণ্ডারে একটি প্রতিবয়ান, প্রান্তের জীবনশক্তি এবং বাংলাদেশের হাজার বছর টিকে থাকার ভিত্তির অনুসন্ধান।

৬.১.১. কেন্দ্র এবং প্রান্ত

আধুনিক শিল্পীদের বিষয়বস্তু প্রায়শই শহুরে জনগোষ্ঠী। শহুরে মানুষের যান্ত্রিক জীবনের জটিলতা, একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা। দীর্ঘ সারি-সারি দালানে থাকা মানুষের দৃষ্টি জানালা দিয়ে বেশি দূর প্রসারিত হতে পারে না অন্য কোনো দালানের জন্য। তাই তাদের অভিজ্ঞতা, একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা হয়ে উঠেছে বিমূর্তবাদী, অভিব্যক্তিবাদী এবং পরাবাস্তববাদী শিল্পীদের বিষয়বস্তু। কিন্তু চারদশক আগে ঢাকার বাস্তবতা এমন ছিল না। তখন দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করার মত দীর্ঘ সারি-সারি দালান ছিল না। পুঁজির চাপে ঢাকার মানুষের নিরন্তর ছুটে চলার জীবন ছিল না। সর্বোপরি, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আশানুরূপ উন্নতি না হলেও প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের মানুষের মতো হতাশা এবং বিষণ্নতা ছিল না। অথচ কখনো-কখনো বাংলাদেশের শিল্পী পাশ্চাত্যের অঙ্কনরীতির সাথে সাথে বিষয়বস্তুও নিয়ে এসেছেন। যা ঢাকার নাগরিক জীবনের সত্যভ্রম নির্মাণ করেছে।

অন্যদিকে ঢাকার যে অল্প কিছু শিল্পীর বিষয়বস্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও নিসর্গ, তাদের উপস্থাপনা ঔপনিবেশিক উপস্থাপনা থেকে ভিন্ন নয়। ঔপনিবেশিকদের মতো তাদের ছবিতেও গ্রামীণ জীবন ধরা পড়েছে নিসর্গের অংশ– 'বিচ্ছিন্ন কোনো অপর' রূপে। এই লোকজ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা, জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি খুঁজতে ব্যর্থ হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে শহুরে মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক সংকট চিহ্নিত করতে বাধা সৃষ্টি করেছে। যে কারণে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতা-উত্তর অধিকাংশ চিত্রে এদেশের সমাজ-ইতিহাস-দর্শনের অভাব রয়েছে। ফলে, বাংলাদেশের নন্দন-ভাবনা হয়ে পড়েছে বিজাতীয় এবং লোকজ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। আধুনিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক শিল্প

নাগরিক জীবনের সংকট এবং আত্মসমালোচনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কারণ ব্যাখ্যা করে ক্যামেরোন ম্যাকার্থি এবং গ্রেগ দিমিত্রিয়াদিস বলেন—

> The modern art object is located squarely in the metropolitan centre, its elaboration of capitalism, and its sinuous culture industry. Modern art by this process is so compromised by the routinization and mass-mediated processes of the culture industry that it is said to have lost its unique capacity to critique or instruct.
>
> [Mccarthy and Dimitriadis, ২০০০: ২৩1]

ম্যাকার্থি এবং দিমিত্রিয়াদিস-এর আধুনিক শিল্পের প্রবণতাবিষয়ক বিশ্লেষণ আমাদের বুঝতে সহায়তা করে– কেন সুলতানের বিষয়বস্তু গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সবসময় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, কলকাতার মধ্যবিত্তের জীবনযাপন ভাবনা, চিন্তা এবং রুচি নির্মাণে পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রসঙ্গে। ঢাকার বাস্তবতার মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও ঢাকার প্রভাবশালী সংস্কৃতিতে একই বিষয়ের সত্যতা রয়েছে। যে কারণে সুলতান গ্রামীণ মানুষের কর্মময় জীবন বেছে নিয়েছেন। তিনি গ্রামীণ মানুষকে শুধুমাত্র উৎপাদনের ভিত্তিই মনে করেননি, মনে করেছেন বিউপনিবেশিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিত্তিও। তার এই ভাবনায় ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের সারসত্তাবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি উৎপাদন ও জীবনযাপনের এমন অংশকে উপস্থাপন করেছেন যা কালান্তরে অপরিবর্তনশীল এবং ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি তার কোনো বিকৃতি ঘটাতে পারেনি। এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, সুলতানের চিত্রকলা ভাবনির্ভর, যা হ্যাবেল, কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই ভাব আধ্যাত্মিকতা নয়। হাজার বছরের শোষণ, শাসন এবং বিজাতিদের লুটের পরে টিকে থাকার ক্ষমতা, গ্রামীণ জীবনের উৎপাদনব্যবস্থা এবং তাদের কর্মময় জীবন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সুলতান মনে করতেন প্রাচ্যবাদী এবং বঙ্গীয় পুনর্জাগরণবাদীরা এই অঞ্চলের ভুল আত্মসত্তা চিহ্নিত করেছেন।

এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থের ভূমিকায় সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং সুবীর চৌধুরী (১৯৯৫) সুলতানের ছবিকে 'নিম্নবর্গীয় স্বপ্ন' বা 'Subaltern vision' রূপে চিহ্নিত করেন। মনজুরুল এবং সুবীর নিম্নবর্গের স্বপ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। কিন্তু শাব্দিক অর্থ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি শহুরে শ্রমিক শ্রেণি বা গ্রামের কৃষক নিম্নবর্গের একটি উদাহরণ। তাদের জীবনের স্বপ্নই হচ্ছে নিম্নবর্গীয় স্বপ্ন। সুলতানের

বিষয়বস্তু কৃষক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমেয়, কৃষকের স্বপ্নই মনজুরুল এবং সুবীর ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু সুলতানের বিষয়বস্তু কৃষকের স্বপ্ন নয়। তা হলো হাজার বছরের বাংলাদেশের কৃষকের কর্মময় জীবন, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে টিকে থাকার লড়াইসহ গ্রামের প্রান্তিক কৃষকের জীবনের মহাবয়ান। যা সুলতানের কাছে পরম সত্য/বাস্তবতা বলে ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইতিহাস বিশেষজ্ঞ পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৪), রণজিৎ গুহ (২০০১) ও গৌতম ভদ্র (১৯৯৪) মনে করেন, কৃষকের সচেতন রাজনৈতিক চৈতন্য রয়েছে এবং তারা সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব করতে সক্ষম। কিন্তু সুলতানের চিত্রকলায় স্থান, কাল, ব্যক্তি নির্বিশেষে যে-বাস্তবতার বয়ান আছে তা হচ্ছে প্রকৃতি, শোষণ ও বঞ্চনার মধ্যে টিকে থাকার মানসিক শক্তি। বৃহৎ কোনো রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ইঙ্গিত এখানে নেই। এখানেই হয়তো সুলতানের সাথে পার্থ, রণজিৎ এবং গৌতমের কৃষক-চৈতন্য পাঠের ভিন্নতা। এজন্য বলা যেতে পারে, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং সুবীর চৌধুরী যে অর্থে নিম্নবর্গীয় স্বপ্নের কথা বলে থাকেন না কেন তার কোনো ইঙ্গিত সুলতানের শিল্পকর্মে নেই। সুলতান মনে করতেন বাংলাদেশের কৃষকরা যুদ্ধ করেছেন, তাদের প্রত্যাশা ভেঙেছে, কিন্তু তাদের কাছে তা কোনো রাজনৈতিক অভীক্ষা নয়। তিনি শাহাদুজ্জামানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "অনেক আশা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু They were betrayed। এই যে একটি exploration procss, আমার ছবিগুলো তার প্রতি চ্যালেঞ্জ।" [শাহাদুজ্জামান, ১৯৯৪:১৪]

৬.১.২. আত্মপরিচয়ের প্রতিবয়ান

যে কোনো বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে আত্মপরিচয়। সুলতান সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তার শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুতে। একই সাথে তিনি ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে উপনিবেশিত উপস্থাপনার রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তার শিল্পকর্মে সেই বয়ানের প্রতিবয়ান রয়েছে। এই উপস্থাপনের রাজনীতি নিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ বিষয়ে ইয়ং বলেন—

> Colonial and Imperial rule was legitimized by anthropological theories which increasingly portrayed the peoples of the colonized world as inferior, childlike, as feminine, incapable, of looking after themselves (despite having done so perfectly well for millennia) and requiring the paternal rule of the west for their own best interests.
> [Young, ২০০৩: ৩]

সুলতানের প্রতিবয়ান পাশ্চাত্যের ক্ষমতা এবং সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবে বৈধতা প্রদানকারী জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু সুলতান পাশ্চাত্যের সর্বগ্রাসী বয়ানের বিপক্ষে যে প্রতিবয়ান দাঁড় করান তা বেঙ্গল স্কুলের অধ্যাত্মবাদ থেকে ভিন্ন। আমাদের ভাবনাজগৎ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ নয়। আমাদের চিন্তার ইতিহাসে যেমন বস্তুবাদের স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় ঠিক তেমনি যুক্তিনির্ভর দর্শন চর্চারও সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তার উদাহারণ হচ্ছে *ন্যায়সূত্র*, *কথাভাথু*, *হেতুবিন্দু*র মত গ্রন্থসমূহ। এ থেকে অনুমেয় ভারতের মূলধারার চিন্তা আধ্যাত্মিক নয়, বরং যুক্তিনির্ভর। তবে সেই যুক্তি পাশ্চাত্যের আদলের নয় [বিস্তারিত- নিজার, ২০১২]। আমাদের অধ্যাত্মবাদী আত্মপরিচয় নির্মাণ করতে গিয়ে আমাদের ভাবনাজগৎ, সংস্কৃতি, শিল্পকলার একটি বড় অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে নতুবা বিকৃত কিংবা বিকৃতভাবে আংশিক উপস্থাপন করা হয়েছে। এই আত্মপরিচয় যেমন গ্রামের লৌকিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন তেমনি শহুরে মধ্যবিত্তের জাগতিক সমস্যার সমাধান করতেও ব্যর্থ। তারই পরিণতি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্ম (ভারত ও পাকিস্তান)।

ঔপনিবেশিক জ্ঞানকণ্ডে উপস্থাপিত প্রাচ্যের মানুষ দুর্বল, অলস, কর্মবিমুখ, নারীসুলভ। যারা নিজেদের রক্ষা এবং শাসন করার ক্ষমতা রাখে না। এই মতের প্রতিষ্ঠা ঔপনিবেশিক শাসনের নৈতিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। তখন পুনর্জাগরণবাদীগণ জাতীয় পরিচয়ের অনুসন্ধান করেন আধ্যাত্মিক নারীর মধ্যে। যে নারী 'মেমসাহেব' নন, কিন্তু তিনি সক্ষমও নন। তিনি কোমল এবং প্রতিকূলতায় আত্মরক্ষা করে চলেছেন। সেখানে সুলতানের কৃষাণ-কৃষাণী পেশীবহুল। এ পেশীর মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেন তাদের হাজার বছর ধরে টিকে থাকার মনোবল। এ পেশী নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। যা কিনা সুলতানের কৃষাণ-কৃষাণীর জীবনের মূল চেতনা। তাই, সুলতানের শিল্পকর্ম ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের উপস্থাপিত প্রান্তিক কৃষকের জীবনের একটি প্রতিবয়ান।

৬.১.৩. আত্মসত্তার বি-বিচ্ছেদায়ন প্রস্তাব

বেঙ্গল স্কুলের অধ্যাত্মবাদ-নির্ভর আত্মপরিচয় নির্মাণকে দ্বি-বিচ্ছেদায়ন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিচ্ছেদায়ন নিয়ে হেগেল এবং মার্কস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু, আমাদের বর্তমান আলোচনা মার্কসীয় বিচ্ছেদায়ন ধারণার সাথে যুক্ত। মার্কস তার *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844* গ্রন্থে উৎপাদন, শ্রম এবং উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে চার ধরনের বিচ্ছেদায়ন চিহ্নিত করেন- ১. উৎপাদিত পণ্য থেকে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতাবোধ,

২. উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ, ৩. আত্মসত্তা থেকে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং ৪. একে অপর থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ [Tucker, ১৯৭৫]। সমকালীন সমাজতাত্ত্বিকগণ আত্মসত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধকেই বিচ্ছেদায়ন বলে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই আত্মসত্তায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আবার যখন নতুন আত্মসত্তা নির্মাণ করা হয় তখন দ্বি-বিচ্ছেদায়ন ঘটে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে উৎপাদনব্যবস্থা কৃষিনির্ভর। সেখানে উৎপাদক এবং উৎপাদনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতে বৃহৎ কলকারখানা, রাবার বাগান বা চা বাগান করা শুরু হয়। তখন থেকে উৎপাদক এবং উৎপাদনের সম্পর্ক পরিবর্তন হতে থাকে। সে সময় শ্রমিকের যোগান দিত এক শ্রেণির দালাল। বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নিয়ে আসা হতো। ফলে তাদের জন্মস্থান থেকে বিচ্ছেদ ঘটে। একই সাথে নতুন পেশা তাদের জীবনযাপন, আত্মসম্পর্ক, ভাবনাগুলো নতুন করে নির্মাণ করেছে। ফলে নির্মাণ হয়েছে নতুন সত্তা, যা পূর্ব থেকে ভিন্ন। এ প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা হয় 'আত্মসত্তার বিচ্ছেদায়ন' হিসেবে।

কিন্তু এই বিচ্ছেদায়ন পুনরায় সংঘটিত হয়, যখন বিউপনিবেশায়নের প্রত্যয় নিয়ে আমরা পাশ্চাত্য উপনিবেশায়ন প্রতিরোধের ভাষা খুঁজি 'প্রাচ্যবাদী' জ্ঞানকাণ্ডে। প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাক-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশের উপর ভিত্তি করে আত্মপরিচয় নির্মাণ করে। এই নির্মিত আত্মপরিচয় যখন 'আধ্যাত্মিকতা', তখন তা পুনরায় আত্মসত্তার বিচ্ছেদ ঘটায় অর্থাৎ আত্মসত্তার দ্বি-বিচ্ছেদায়ন হয়।

সুলতান 'আত্মসত্তার দ্বি-বিচ্ছেদায়ন' প্রসঙ্গের সাথে পরিচিত ছিলেন না কিন্তু তা উপলব্ধি করতে পারতেন। সুলতান দ্বি-বিচ্ছেদায়ন থেকে বের হতে চেয়েছেন। তার এই প্রবণতাকে বি-বিচ্ছেদায়ন বলা যেতে পারে। যা মার্কসীয় বি-বিচ্ছেদায়ন প্রস্তাব থেকে ভিন্ন। মার্কস ভেবেছেন উৎপাদন যখন সৃষ্টিশীল হবে এবং লগ্নি ও উৎপাদনের অংশীদার শ্রমিক শ্রেণি হবে তখন বি-বিচ্ছেদায়ন ঘটবে। কিন্তু সুলতানের ভাবনা ভিন্ন এবং অপরিপক্ব। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যবাদের থেকে বি-বিচ্ছেদায়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তি মনে করেছেন হাজার বছরে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সেই উৎপাদন ব্যবস্থাকেন্দ্রিক কৃষকের সংস্কৃতিকে। সেই কারণে বলা যেতে পারে সুলতানের ছবি ঔপনিবেশিক কালে এবং তার উত্তরপর্বে আমাদের সংস্কৃতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থা যে বিচ্ছেদায়নের মধ্য দিয়ে গেছে তা থেকে বি-বিচ্ছেদায়নের একটি প্রস্তাব।

সুলতান ওয়াকিবহাল যে, হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠী দ্বারা বাংলাদেশের কৃষক নিপীড়িত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমার ছবিগুলো তার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ। শোষণ কর, কোনো মশা এদের খেয়ে শেষ করতে পারবে না। ব্রিটিশরা করেছে, পাকিস্তানিরা লুটেপুটে খেয়েছে, এখনও চলছে কিন্তু ওরা অমিয় শক্তিধর। কৃষককে ওরা শেষ করতে পারবে না, আমার কৃষক এরকম।' [শাহাদুজ্জামান, ১৯৯৪: ১৫]

নীহাররঞ্জন রায় তার *An Approch to Indian Art* গ্রন্থে ভারতের চিত্রকলার গতিবিধি এবং প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ভারতের চিত্রকলার আধ্যাত্মিকতা এবং তত্ত্ববিদ্যা থেকে বের হয়ে আসা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, চিত্রকলাকে তাত্ত্বিকভাবে আরো ইতিহাস, সমাজবিদ্যা এবং মানববিদ্যা অভিমুখী হওয়া উচিত। একই ধরনের আভাস পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের শেষের দিকে লেখায়–

> ঝুপ করে ভারতশিল্পে আধ্যাত্মিক অংশ ছোঁ দিয়ে তুলে ফেললেন, এতে ভয় আছে, বাধাও আছে– ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার বাধাও নেই, ভয়ও নেই। অবশ্য এভাবে চললে ভারতশিল্পের মর্মে পৌঁছাতে সময় লাগবে, কিন্তু নারিকেলের শাঁস জলে পৌঁছাতেও একটু সময় লাগে
>
> [অবনীন্দ্রনাথ, ২০১২(২) : ১৯৭]

অবনীন্দ্রনাথের দ্বিধা খানিকটা হলেও নীহাররঞ্জন রায় উপলব্ধি করেছিলেন। সুলতানের কাজ তা বাস্তবতায় পরিণত করেছে। তিনি বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়নের মূল ভিত্তি হিসেবে লৌকিক সংস্কৃতির কর্মময় জীবনকে চিহ্নিত করেছেন, যা একই সাথে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিবয়ান এবং আত্মসত্তার বি–বিচ্ছেদায়ন প্রস্তাব।

৬.১.৪. দ্বৈত চিত্ত

উপনিবেশোত্তর শিল্প-ভাবনার অন্যতম প্রবণতা বিউপনিবেশায়ন হলেও তা একমাত্র প্রবণতা নয়। সেখানে প্রায়শই দ্বৈত চিত্ত-এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'চিত্ত' পালি শব্দ। বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনে 'চিত্ত' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে 'সচেতন চিন্তার প্রবাহ'। তা সব সময় বিষয় কেন্দ্রিক হলেও কোনো মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা নয়, বরং একটি চলমান প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কোনো বিষয় সম্পর্কিত এবং তার সাথে যুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন যে চিন্তা চলতে থাকে তাকে চিত্ত বলে। এই প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, আগের ভাবনাজগতের সাথে পরের ভাবনাজগতের সম্পর্ক

থাকলেও তা সামান্য সম্পর্ক নয়। বিশেষ সময়ে অনেক লোকের চিত্ত-এর মধ্যে সামান্য চিত্র পাওয়া কঠিন। তাই বিশেষ সময়ে সামষ্টিক চিত্ত-এর কোনো সামান্য চিত্র থাকে না। কিন্ত ঐতিহাসিক সামষ্টিক চিত্ত-এর একটি সামান্য চিত্র এবং অভিমুখিতা পাওয়া যায়। কারণ দীর্ঘকালিক ব্যবধান বিবেচনার কারণে অভিব্যক্তি এবং অভিমুখিতার সামান্য চিত্র পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত নয়; ভবিষ্যতে তার পরিবর্তন নিশ্চিত। বর্তমান আলোচনায় চিত্ত শব্দটি ভিন্ন কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মানব-মনে একই সাথে একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী চিন্তা চলতে থাকে। একে দ্বৈত চিত্ত বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উত্তর-ঔপনিবেশিক মননের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বৈত চিত্ত। উপনিবেশের কালে জনমনে একদিকে থাকে ঔপনিবেশিক চিন্তাকাঠামো থেকে বের হয়ে আসার প্রবণতা, অন্যদিকে থাকে ঔপনিবেশিক চিন্তার প্রভাব। কিন্তু এই ধরনের দ্বৈত চিত্ত-এর প্রভাব উপনিবেশকালে এবং উপনিবেশোত্তর পর্বেও লক্ষ করা যায়।

দ্বৈত চিত্ত আমাদের আধুনিক কালের কবি, ঔপন্যাসিক এবং চিত্রশিল্পীদের মাঝেও লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি 'আত্মপ্রতিকৃতি' কবিতায় ঔপনিবেশিক ভাবনা এবং রুচি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন,–

> আমি তো বিদেশী নই, নই ছদ্মবেশী বাসভূমে–
> তবে কেন পরিচয় অন্ধকার ঘরে রাজা, কেন
> দেশের দশের কাছে সারাটা জীবন ডুগডুগি
> বাজিয়ে শোনাবো কথা, নাচাবো বানর ফুটপাতে?
> কেন তবে হরবোলা সেজে সারাক্ষণ হাঁটে মাঠে
> বাহবা কুড়াবো কিংবা স্টেজে খালি কালো রুমালের
> গেরো খুলে দেখাবো জীবন্ত খরগোশ দর্শকের
> সকৌতুক ভিড়ে? কেন মুখে রঙ মেখে হবো সঙ?
>
> [শামসুর, ১৯৭৬: ৫১]

ভণিতা ভণ্ডামি ছেড়ে তিনি এখানে আত্মসত্তা অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে আত্মসত্তার বি-বিচ্ছেদায়ন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি অন্যত্র ভিন্ন ভাবনা প্রকাশ করেন। 'ফিরে আয় উত্তরাধিকারী' কবিতাটি একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে হলেও শামসুর রাহমান যে 'দ্বৈত চিত্ত' এর অধিকারী তা স্পষ্ট। যে ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধে নিভৃতে ফিরে যাবার কামনা ছিল, আধুনিক হওয়ার কামনায় তা থেকে দূরত্বও সৃষ্টি

কিনডে ওয়াইলি, নেপোলিয়ান লিডিং দি আর্মি ওভার দি আল্পস, তেলরং, ২৭৪.৩×২৭৪.৩ সেমি, ২০০৫
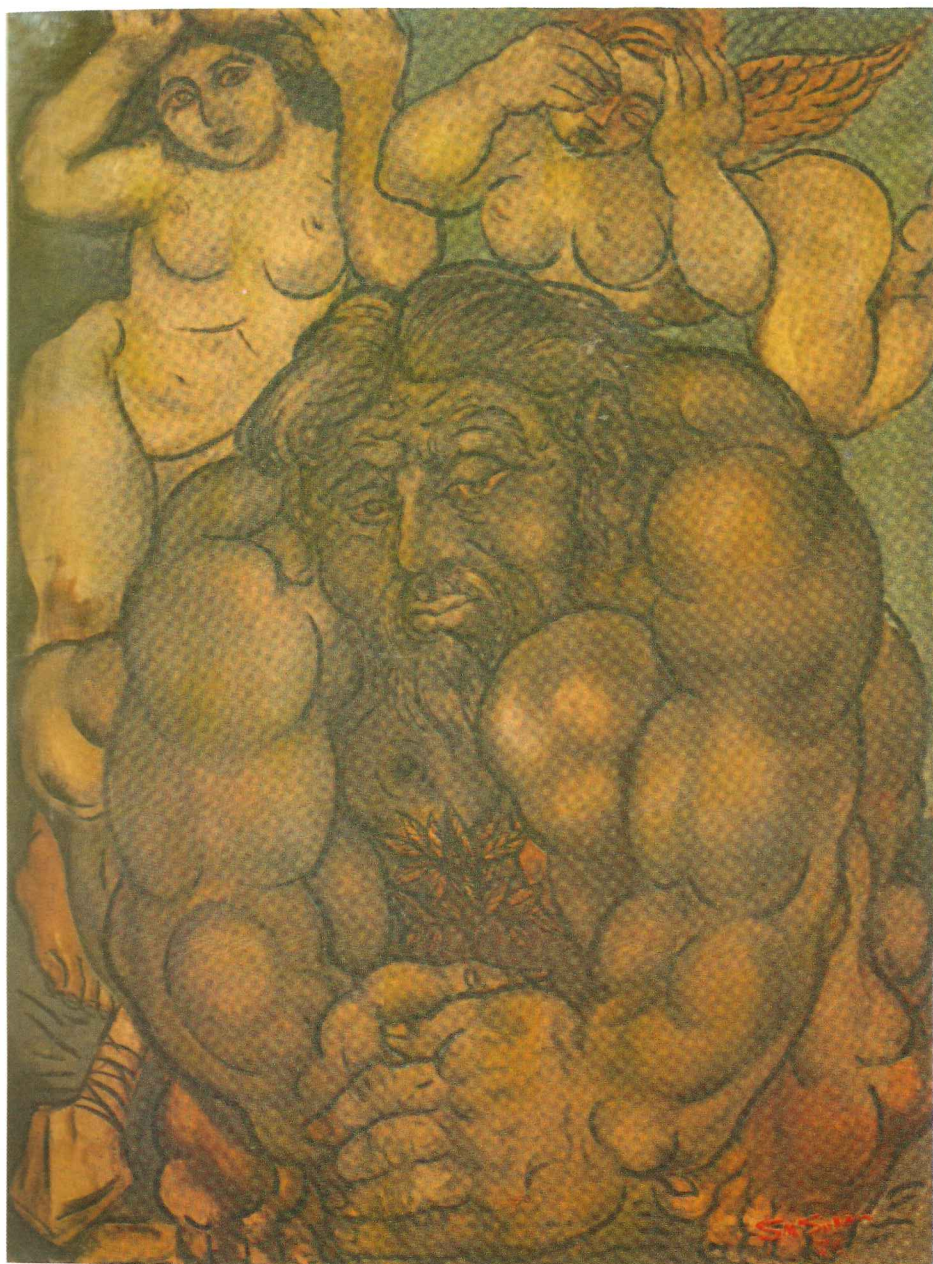
এস এম সুলতান, প্রথম বৃক্ষরোপণ, তেলরং, ১৪৫×১০৮ সেমি, ১৯৭৫

হয়েছে। কিন্তু উত্তর প্রজন্ম যখন তাও ছাপিয়ে যেতে চায়, তখন ভয়ার্ত হাহাকার শোনা যায় তার মুখে। কখনো আত্মসত্তার বি-বিচ্ছেদায়ন প্রচেষ্টা আবার কখনো তা থেকে বিচ্ছেদ ঘটানোর আকাঙ্ক্ষা–এই হচ্ছে দ্বৈত চিত্ত-এর উদাহরণ। দ্বৈত চিত্ত ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেশজ মূল্যবোধের মাঝে আটকে থাকা অমীমাংসিত মননবিশ্ব। উপনিবেশিত মনস্তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই দ্বৈত চিত্ত; তা অবশ্যই উপনিবেশোত্তর পর্বেও সত্য। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান শিল্পী কিনডে ওয়াইলির শিল্পকলায় অসাধারণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই দ্বৈত চিত্ত।

কিন্তু উত্তরপর্বে সুলতানের কাজে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। যদিও প্রথম বৃক্ষরোপণ (১৯৭৫) দেখে মনে হতে পারে সুলতানের দ্বৈত চিত্ত রয়েছে। চিত্রটির বিষয়বস্তু একটি কাল্পনিক ঘটনা, যা একই সাথে কৃষকের জীবনের প্রত্যেক দিনের বাস্তবতা। তিনি কৃষক জীবনের সেই মুহূর্তকে চিত্রিত করেছেন যা কৃষক বৃত্তির প্রথম মুহূর্ত। যখন একজন অজ্ঞাতনামা কৃষক প্রথম বৃক্ষ রোপনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার গোড়াপত্তন করছেন ঠিক তেমনি জীবিকার জন্য প্রকৃতি কিংবা ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর যে নির্ভরশীলতার কথা মধ্যপ্রাচ্যীয় ধর্মে উল্লেখ রয়েছে তার সমাপ্তির প্রথম মুহূর্ত। সেই মুহূর্তে মানুষ তার ভাগ্যবিধাতায় পরিণত হচ্ছে। বিচ্ছেদ ঘটছে ঈশ্বরের সাথে মানুষের। এই বিশেষ মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছেন দুই নারী, একজন মানবী আরেকজন অতিমানবী–পরী বা ফেরেস্তা। এখানেও পার্থক্য রয়েছে ম্যানারিজম এবং রেনেসাঁ শিল্পীদের সাথে। রেনেসাঁ শিল্পীরা ধর্মীয় ঘটনার স্তুতি করছেন এবং ম্যানারিস্ট শিল্পগণ ইশারা-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে দ্বিধা প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন, সেখানে প্রথম বৃক্ষরোপণ মধ্যপ্রাচ্যীয় সৃষ্টিতত্ত্বের বিনির্মাণ, এমনকি প্রতিবয়ানও বলা যেতে পারে। অন্যদিকে, চিত্রটির অঙ্কন কৌশল যেমন রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত নয় ঠিক তেমনি ভারতশিল্পের অভিমুখিতা বর্তমান [বিস্তারিত- ৬.২]। তাই ডানাওয়ালা অতিমানবী দেখে ভাবার কোনো কারণ নেই তা পাশ্চত্যের প্রভাব যেহেতু জিন/পরী বা ফেরেস্তা প্রাক-ঔপনিবেশিক বিশ্বাসের অংশ। তাছাড়া দ্বৈত চিত্ত কোন মানসিক দশা নয় বরং চলমান প্রক্রিয়া। ওয়াইলির অনেকগুলো ছবিতে সচেতনভাবে দ্বৈত চিত্তের ইঙ্গিত দিয়েছেন। একটি চিত্র কখনই দ্বৈত চিত্ত প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। এ সব কারণে বলা যায় দুই প্রবাহমান চিত্তের মাঝে সুলতানের কাজ আটকে নেই। বরং প্রচেষ্টা আছে ঔপনিবেশিক ভাবনাগুলো চিহ্নিত করে মাড়িয়ে ওঠার। তাই সুলতানের মননে দ্বৈত চিত্ত লক্ষ করা যায় না। আর সে কারণে অপরাপর উপনিবেশ এবং উপনিবেশোত্তর পর্বের শিল্পীদের থেকে তার কাজে ভিন্নতা রয়েছে।

৬.২. অঙ্কনরীতি

৬.২.১. রেখা

সুলতান বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন আত্মসত্তার অন্বেষণ করেছেন তেমনি অঙ্কনরীতির ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র বিউপনিবেশায়ন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি প্রাক-ঔপনিবেশিক অঙ্কনরীতির সৃষ্টিশীল রূপান্তর করেছেন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি অঙ্কনরীতি প্রসঙ্গে ঢাকার শিল্পীগণ গভীরভাবে পাশ্চাত্য অঙ্কনরীতি দ্বারা প্রভাবিত। অন্যদিকে, আঙ্গিকগত দিক থেকে তিনি কেবল দেশজ অঙ্কনরীতিতেই ফিরে যেতে চাননি, দেশজ অঙ্কনরীতির উন্নয়নেও সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি মনে করতেন, সমাজ এবং বাস্তবতার কারণে আমাদের পক্ষে অউপনিবেশিত অঙ্কনরীতিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়; এমনকি সম্ভব হলেও তার প্রয়োজন নেই। তার এই ভাবনা স্পষ্ট হয় যখন পটুয়া রেখা নিয়ে আলাপচারিতার একপর্যায়ে তিনি বলেন 'পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে, Science অনেক দূর এগিয়েছে, এখনতো বাঙ্গালির ঐ পটুয়া line–এ কাজ করলেই শুধু হবে না। পটুয়া line-এর character-টা ধরে নতুন করে ভাবা যেতে পারে।' [শাহাদুজ্জামান, ১৯৯৪: ২৩]

৬.২.২. পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের শিল্পবোদ্ধা ও রসিকদের কাছে সুলতানের অঙ্কনরীতি ধরা পড়েছে 'অনাধুনিক' বা 'নাইভ' হিসাবে [জাহাঙ্গীর, ১৯৯৫; নজরুল, ২০০৯]। আবার, কারো কারো কাছে সুলতানের অঙ্কনরীতি ধরা পড়েছে ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের বিচ্ছিন্ন রূপ [ছফা, ১৯৯৫: ১০৫]। আহমদ ছফা মনে করেন, 'হ্যাবেল ভারতীয় শিল্পাদর্শের যে ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন কেউ তার আওতা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি– একমাত্র সুলতান ছাড়া' [ছফা, ১৯৯৫: ১০০]। ছফা আংশিক ভুল, সুলতানের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে হ্যাবেলীয় ভারতীয় শিল্পাদর্শের প্রভাব নেই কিন্তু অঙ্কনরীতির ক্ষেত্রে হ্যাবেলীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ভারতবর্ষের চিত্রকলা ভাবনির্ভর। রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত সেখানে সব সময়ই গুরুত্বহীন। এ প্রসঙ্গে হ্যাবেল বলেন, 'Indian artistic anatomy is a possible and consistent ideal anatomy, and Indian perspective is a possible and consistent ideal perspective.' [Hevell. ১৯২০: ১২২,১২৩] । সুলতানের কাজেও পরিপ্রেক্ষিত অনেক বেশি অনুপস্থিত। তার অন্যতম কারণ, সুলতানের চিত্র ভাবনির্ভর। ভাববস্তুর ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব থাকায় তার পারিপার্শ্বিক গুরুত্বহীন হয়ে

উঠেছে। তাই পরিপ্রেক্ষিতের উপর তিনি গুরুত্ব দেননি। অন্যদিকে, সুলতানের এই স্বাতন্ত্র্যও বাংলাদেশের অনেক শিল্পরসিকদের কাছে ধরা পড়েছে আধুনিক ব্যাকরণসিদ্ধতার অভাব হিসাবে।

প্রত্যেক কৌশলের কতগুলো সীমাবদ্ধতা থাকে। জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের মাধ্যমে বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করা সম্ভব। জগতের দুই বস্তুর দূরত্ব এবং আকার যথার্থভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতা রয়েছে জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের। কিন্তু দুই বস্তুর মাঝে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল ব্যবহার করে প্রকাশ সম্ভব নয়। এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে কখনো প্রতীক, কখনো শারীরিক অঙ্গভঙ্গি অথবা রং-এর বিশেষ অর্থ প্রদানের মধ্য দিয়ে। ফলে, ইউরোপীয় ম্যানারিজম বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি নির্মাণের চেয়ে চিহ্নব্যবস্থার মধ্যে অধিক ঢুকে পড়ে। এ কারণে এসব চিত্রের সমঝদার হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে চিহ্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যসহ বিশ্বের অপরাপর সকল এলাকায় 'মানবীয়সম্পর্ক' চিত্রে প্রকাশ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যা সুলতানেরও সমস্যা। এই সমস্যা সুলতান একভাবে সমাধান করেছেন। বিশ শতকে ইউরোপের আরো দুটি ধারা মানবীয় সম্পর্ক উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে ভিন্ন ভাবে। সেগুলো হল জার্মানির জাদুবাস্তববাদ এবং কোভাসিকার সহজাত অঙ্কন ধারা। বিস্ময়কর হলেও সত্য সুলতানসহ ইউরোপীয় দুটি ধারাই এই মানবীয় সম্পর্ক উপস্থাপন করেছে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত ভেঙে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

সুলতানও মানবীয় সম্পর্ক উপস্থাপন করতে গিয়ে জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল ভেঙে দিয়েছেন। তার পঞ্চাশের এবং ষাটের দশকে আঁকা ছবিগুলোতে জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে। সেই ছবিগুলোতে তার উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মিরের নিসর্গের প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন। সেখানে মানুষ প্রকৃতির অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সুলতানের চিত্রকর্মের বিষয় মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক। এই 'সম্পর্ক' উপস্থাপনের কৌশলগত অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছেন অজন্তার দেয়ালচিত্র থেকে। তাই তার মানুষের দেহগুলো একে অপরকে স্পর্শ করে আছে। কখনো হেলে আছে, আবার কখনো শুয়ে আছে। কিন্তু কখনই সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। কখনো এককে অপর থেকে স্বতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো প্রচেষ্টাও নেই। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে গণহত্যা ছবিটি। সেখানে পরিপ্রেক্ষিত আছে কিন্তু তা জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত নয়। পরিপ্রেক্ষিত ততটুকুই ব্যবহার করা হয়েছে যতটা প্রয়োজন হয়েছে

ভাব প্রকাশের জন্য। তাই নিশ্চিন্তভাবে বলা যেতে পারে, জগতের প্রতিচ্ছবি নয়, সুলতানের চিত্রের কৌশলকে প্রভাবিত করেছে সত্যভাব। বাংলাদেশের হাজার বছরের কৃষকের জীবনের বয়ানই তার চিত্রের মূল ভাব। তাই তার চিত্রকর্মে হ্যাবেলীয় ভারতীয় শিল্পদর্শন যেমন উপস্থিত, তেমনি অনুপস্থিত জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত।

জাদুবাস্তববাদ এবং কোডাসিকার সহজাত অঙ্কন ধারাও সম্পর্ককে চিত্রে উপস্থাপন করার চেষ্ঠা করেছে কিন্তু সুলতানের কৌশলের তার সাথে পার্থক্য আছে। জাদুবাস্তববাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান শিল্প ধারা, তা পরবর্তীকালে ল্যাটিন আমেরিকান জাদুবাস্তববাদকে প্রভাবিত করেছে। জার্মান চিত্রসমালোচক ফ্রানৎস রহ (১৮৯০-১৯৬৮) জার্মান ভাষায় 'জাদুবাস্তব' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ১৯২৫ সালে রহ জামার্নিতে চর্চিত উত্তর-অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকলার উপর *Post-Expressionism, Magic Realism: Problems of the most Recent Europian Painting* নামক একটি বই লেখেন। সেই বইতে তিনি প্রথম জার্মান শব্দ 'Magischer Realismus' ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে স্পেনিশ 'Realismo Magico' এবং ইংরেজিতে 'Magic Realism' অনুবাদ করা হয়। রহ বিশের দশকের পনেরো জন চিত্রশিল্পী; অটো ডিক্স, মার্ক্স আরনেট, আলেক্সান্ডার কানলডাথসহ অন্যদের অঙ্কনরীতির বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করতে গিয়ে লক্ষ করেছিলেন– ছবিগুলো আলোকচিত্রের মত স্বচ্ছ এবং বিস্তারিত, কিন্তু এগুলোর পরিপ্রেক্ষিত প্রথাগত পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের থেকে ভিন্ন। অটো ডিক্সের একটি ছবি *Match Seller I* (১৯২০)-তে দেখা যায় ফুটপাতে বসে থাকা একজন পঙ্গু, যার বিশাল চেহারার তুলনায় দেহ অত্যন্ত ছোট এবং একটি কুকুর তার পায়ে মূত্ররত। ডিক্স আমাদের পরিচিত বাস্তবতাকে নতুন রূপে উপস্থাপন করেন যা অভিব্যক্তিবাদী চিত্রসমালোচকদের কাছে রীতিসিদ্ধ মনে নাও হতে পারে এবং তা সালভাদর দালির পরাবাস্তববাদী চিত্ররীতি থেকেও ভিন্ন।

অভিব্যক্তিবাদী চিত্রশিল্পী ইমিল নলড, কোকোশকা, বেকমানসহ অন্যরা শিল্পকর্মে বস্তুগত স্বরূপের উপর গুরুত্ব না দিয়ে অভ্যন্তরীণ উপলব্ধিকে রেখা ও রং-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তারা মানব-মনের চরমতম অনুভূতিকে বা অবস্থাকে রেখা ও রং-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ফ্রানৎস রহ অটো ডিক্সসহ অন্যদের কাজের মধ্যে পার্থিব পদার্থের মধ্যে অপার্থিব চেতনার প্রকাশ লক্ষ করেছিলেন।

মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পদার্থ বা বস্তুর

অটো ডিক্স, ম্যাচ সেলার ১, তেলরং, ১৯২০

সম্পর্ক স্থানিক এবং কালিক। তা সময়ের সাথে সাথে পরিবতর্নশীল। তা রহস্যময় এবং অনেক সময় দৃষ্টির অগোচরে থাকে। রহ-এর মতে, আমাদের চারপাশে থাকা বস্তুর রহস্যময় চরিত্রই 'জাদু'। তা উপস্থাপন জাদুবাস্তববাদের লক্ষ্য। কিন্তু টেবিলের রহস্যময় চরিত্র শুধু টেবিলের ছবি অঙ্কন করলেই উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই প্রচলিত অঙ্কনরীতিতে তা উপস্থাপন সম্ভব নয়। তৎকালীন জাদুবাস্তববাদী শিল্পীগণ বিভিন্নভাবে বস্তুর রহস্যময় চরিত্র প্রকাশ করেছেন। রহ-এর মতে, এই বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গি পরিচিত বস্তুকে করে তুলেছে অপরিচিত। তাই তার মতে, জাদুবাস্তববাদী শিল্পে- 'The things, the object, must be found anew.' (Bowers, ২০০৪:৮)। ম্যাগি এন ব্রাওয়ারসের মতে, আধুনিক শিল্পীদের মতো জীবন ও জগৎ এবং তা সম্পর্কে পরম সত্য ও উপলব্ধি প্রকাশের মাধ্যম খোঁজাই ছিল জাদুবাস্তববাদী শিল্পীদের অন্যতম প্রচেষ্টা। তিনি বলেন—

> Magic realist painting shares with modernism an attempt to find a new way of expressing a deeper understanding of reality witnessed by the artist and writer through experimentation with painting and narrative techniques.
>
> [Bowers, ২০০৪:৭]

ল্যাটিন আমেরিকার জাদুবাস্তববাদী লেখক আলেহো কারপেনতিয়ার মনে করেন ইউরোপীয় জাদুবাস্তববাদ মেকি প্রবণতা এবং জনমানুষ বিচ্ছিন্ন একটি ধারা। শিল্পবোদ্ধা সারজিওস মিখালেস্কি (১৯৯৪) অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, জাদুবাস্তববাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান সমাজের বহুমাত্রিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের প্রতিটি দেশ সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউরোপের একটিও গ্রাম পাওয়া যাবে না যা এই ভয়াবহতার শিকার হয়নি। ইউরোপের প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ মারা গিয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার নারী-পুরুষ সকলে হলেও পুরুষের মৃত্যুর হার নারী থেকে অনেক বেশি থাকায় যুদ্ধোত্তর ইউরোপ নারী-পুরুষের স্বাভাবিক অনুপাতের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অবক্ষয় এবং অস্থিরতা। এছাড়া কয়েকশ বছরে বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে ইউরোপ যে সম্পদ ও সমৃদ্ধি অর্জন করে তা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় যুদ্ধের সময়ে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে জার্মানিতে। যুদ্ধ শুরু করার দায়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল জার্মানিকে। ফলে জার্মানির অর্থনীতি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ১৯১৮ সালে কাইজারের

নির্বাসনের পর থেকে ডান ও বামপন্থী বিপ্লবীদের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টার কারণে জার্মানির রাজনীতি অস্থির হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে এডলফ হিটলারের 'ন্যাশনালিস্ট সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি' প্রতিষ্ঠার পর পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিশাল ঘাটতি-বাজেট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, নিরাপত্তাহীনতা এবং দুর্বল সরকার জার্মান জনসাধারণকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় হতাশ করে তোলে। অন্যদিকে ইউরোপের অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতার অনুভব। শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধারা এই অনুভূতির বাইরে ছিলেন না। এই বিচ্ছিন্নতা এবং অনিশ্চয়তা জার্মানদের তাড়িত করে টেকসই বাস্তবতার দিকে; নতুন করে বাস্তবতাকে আবিষ্কার করার দিকে। যা রহ-এর মতে, জাদুবাস্তববাদের মূল উদ্দেশ্য। এই বাস্তবতার অনুসন্ধান অভিব্যক্তিবাদী শিল্প-আন্দোলনকে ছাপিয়ে গিয়ে আঠারো শতকের ক্লাসিক্যাল বাস্তববাদে ফিরে যাবার প্রত্যয় নয় বরং তা হল পার্থিব জগতে অস্তিত্বহীন বস্তুদের মধ্যে সম্পর্ক উপস্থাপনের প্রত্যয়। তাই জাদুবাস্তববাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান সমাজ ও সময় থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তা ওই সময়েরই দাবি। সারজিওস মিখাইলেস্কি এ সম্পর্ক বলেন–

> Ultimately, it was a reflection of German society at that time, torn between a desire for and simultaneous fear of unconditional modernity, between sober, objective rationality and residues of Expressionist and rationalist irrationalities.
>
> [Michalski, ১৯৯৪: ১৩]

তৎকালীন জার্মান চেতনার মত রহ-এর জাদুবাস্তববাদী শিল্প চেতনার ইউরোপীয় মূল ধারার শিল্প আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র প্রবণতা লক্ষণীয়। পরাবাস্তববাদী শিল্প-আন্দোলন উত্তর-অভিব্যক্তিবাদী শিল্প-আন্দোলনগুলোর একটি এবং প্রায়ই অনেক জাদুবাস্তববাদবাদী শিল্পীর কাজ পরাবাস্তববাদী মনে হতে পারে। কিন্তু জাদুবাস্তববাদবাদী ও পরাবাস্তববাদী শিল্প-আন্দোলনের বিষয়বস্তু এবং চেতনা ভিন্ন।

২৪ মে জুন ১৯১৭, কবি এপোলিনিয়র তার ১৯০৩ সালে লেখা *Les Mamelles de Tirésias* নাটকটির পরিচয় দিয়েছিলেন 'ড্রামা স্যুররিয়ালিস্তা' (Drama Surrealiste) বলে। ১৯১৯ সালে আঁদ্রে ব্রেতঁ অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে পরাবাস্তববাদ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি মনে করতেন, মনঃসমীক্ষণ স্বপ্নের বিচিত্র দৃশ্যগত অথবা উপলব্ধিগত যে বিশ্লেষণ প্রদান করে, কাব্যচর্চায় তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রথম দিকে আন্দোলনটি প্রধানত কাব্যচর্চায় সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে

অন্যান্য শিল্পীও এই আন্দোলনে সামিল হন। ১৯২৪ সালের পর থেকে পরাবাস্তববাদ প্রভাবশালী আধুনিক শিল্পধারায় পরিণত হয়। পরাবাস্তববাদী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম জোয়ান মিরো, হ্যান্স অরপ, মার্ক শাগাল এবং সালভাদর দালি।

মনঃসমীক্ষণ-এর জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনে করেন, মানুষের সচেতন মন অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষের পূর্ণাঙ্গ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়। মানুষের অবচেতন বা অচেতন মন তার চিন্তা ভাবনায় গভীরভাবে প্রভাব রাখে। তাই পরাবাস্তববাদী শিল্পের অন্যতম প্রয়াস ব্যক্তির সেই অবচেতন উপস্থাপন করা, যা মানুষের কল্পনা-স্বপ্নগুলোকে ক্যানভাসে বহিঃপ্রকাশ করে।

জাদুবাস্তববাদ ও পরাবাস্তববাদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। জাদুবাস্তববাদ যেখানে পার্থিব বস্তুর মধ্য দিয়ে জগতের অদ্ভুত রহস্যময়ী সম্পর্ক উপস্থাপন করে সেখানে পরাবাস্তববাদ কাল্পনিক-অবাস্তব উপাদানের মাধ্যমে মানুষের অবচেতন এবং অচেতন মন উপস্থাপন করে। যেমন সালভাদর দালির *দি পারসিসটেন্স অব মেমরি*, (*The Persistence of Memory,* ১৯৩১) পরিচিত বস্তুর এক অবাস্তব উপস্থাপনা। আমাদের পরিচিত ঘড়ি যা ধাতুর তৈরি কিন্তু তা নরম মোমের মত গলে পড়ছে। তার উপর থাকা পোকাগুলো সেই ধাতুর তৈরি ঘড়ি খেয়ে চলেছে। এ ধরনের ঘড়ি বা পোকার কোনো অস্তিত্ব আমাদের বাস্তব জগতে নেই। দালি এই ছবির মাধ্যমে স্মৃতির ক্ষয়ের মতো মানবীয় ধারণাকে উপস্থাপন করেছেন।
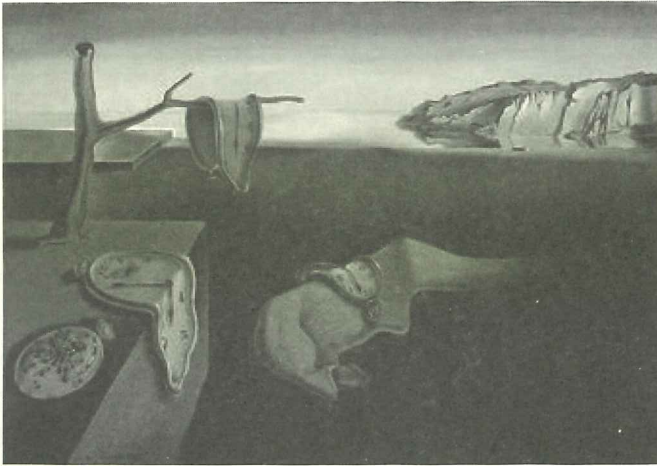
চিত্র-১০ *দি পারসিসটেন্স অব মেমরি* (১৯৩১)

অন্যদিকে রহ-এর জাদুবাস্তববাদী শিল্পকর্মে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পার্থিব বস্তুর মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের রহস্য ও আর্যসত্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে। অটো ডিক্স-এর *Match seller I* (১৯২০) তার মধ্যে অন্যতম জাদুবাস্তববাদী চিত্রকলা। সেখানে তিনি এক পঙ্গুর ফুটপাতে বসে থাকার ছবি অঙ্কন করেন। তার চেহারার আকার দেহের বাকি অংশের সমান এবং কার্টুনের মত মুখ থেকে বিভিন্ন শব্দ বের হচ্ছে। বসে থাকা অবস্থায় একটি কুকুর তার উপর মূত্র ত্যাগ করছে। দুটি ছবির মধ্যে মূল পার্থক্য শুধু বিষয়বস্তুগত নয় বরং ছবিতে উপস্থাপিত বস্তুগুলোর অস্তিত্বের প্রশ্নে পার্থক্য রয়েছে। দালির ছবিতে ধাতুর তৈরি ঘড়ি নরম মোমের মত গলে যাচ্ছে, এটা আমাদের সামনে এক ধরনের অবাস্তব অবস্থাকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে ডিক্সের বিকলাঙ্গ মানব ও কুকুর বাস্তব জগতের অংশ কিন্তু তা বাস্তবতার এক নতুন দিক নির্দেশ করে যা জাদুবাস্তববাদের লক্ষ্য। সুলতানও জাদুবাস্তববাদীদের মতো কৃষকের সাথে তার চারপাশের বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ক উপস্থাপন করেছেন, তবে ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে। কিন্তু সেখানে কৃষকের অবচেতন মন বা রাজনৈতিক কামনা লক্ষ করা যায় না, অন্যথায় তিনি পরাবাস্তববাদীদের মত না হলেও অন্য কোনো কৌশল ব্যবহার করে কৃষকের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ইঙ্গিত দিতেন।

কোভাসিকার সহজাত অঙ্কন ধারাও মানবীয় সর্ম্পককে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। কোভাসিকা সার্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি ছোট্ট শহর। জনসংখ্যা আনুমানিক ছয়-সাত হাজার। শহরটি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তৎকালীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রানী মারিয়া তেরিসা কিছু স্লাবদের সীমানা পাহারা দেওয়ার জন্য এ এলাকায় পাঠান। পরবর্তী সময়ে তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং একটি কৃষিভিত্তিক সমাজও গড়ে তোলে। কোভাসিকা ইউরোপের মধ্যে থেকেও বিশ্বের প্রান্তে থাকা যে কোনো এক ছোট শহরের মতো। তাদের উপর ইউরোপের মূলধারার সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত কম। আনুমানিক ১৯৩৯ সালের দিকে ইউরোপের মূলধারার সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতার কারণে সেখানে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চিত্রাঙ্কনের ধারার বিকাশ হয়। যা কোভাসিকার সহজাত অঙ্কন ধারা নামে পরিচিত। এই ধারা শুরু করেন মার্টিন পালুস্কা (১৯১৩-১৯৮৪) এবং জ্যান শকা। পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনে যুক্ত হন মার্টিন জনাস (১৯২৪-১৯৯৬), জ্যান কোনাসোভিক (১৯২৫-১৯৮৬) এবং ক্যাটরিনা দুজরোসিভা। তাদের কারো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না এবং তারা সবাইকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে নিরুৎসাহিত করতেন। তারা মনে করতেন, শিল্প হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনার

মার্টিন জোনাস, বিহাইন্ড দি পামকিনস, তেলরং, ৩৪×৪৬ সেমি, সত্তুর দশক

বহিঃপ্রকাশ, তার কোনো নির্ধারিত ব্যাকরণ নেই। ফলে কাউকে শিল্প শিক্ষা দেওয়া সম্ভব না। তাদের এই ভাবনার একটা কারণ হতে পারে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর পিছনে সার্বিয়ানদের ভূমিকার দরুণ বিভিন্ন নিগ্রহের মধ্য দিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞতা। সেই সাথে মূলধারার সংস্কৃতি থেকে ভিন্নতার কারণে ইউরোপের মূলধারার সংস্কৃতিকে প্রশ্ন করার এক ধরনের সাংস্কৃতিক ক্ষমতা তাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। ফলে তাদের একদিকে যেমন রয়েছে সকলের শিল্প-ভাবনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রবণতা, তেমনি রয়েছে সরলতাকে উদযাপন করার প্রচেষ্টা। এই শিল্পান্দোলন ষাটের দশকের আগে মূলধারার শিল্পরসিকদের কাছে অজানা ছিল। আনুমানিক ১৯৬১ সালে লন্ডনে তাদের একটি প্রদর্শনী হয়। তখন ইউরোপীয় শিল্পরসিকদের কোভাসিকার সহজাত অঙ্কন ধারা'র শিল্পকর্মের সাথে পরিচয় হয়। তাদের ছবির বিষয়বস্তু কৃষকের জীবন। সেখানে কৃষককে দেখানো হয়েছে বৃহৎ আকৃতিতে। যার সাথে সুলতানের একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অঙ্কনরীতি এবং কৌশল বিবেচনায় উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া সুলতান ১৯৫২-৫৩ সালে লন্ডনে অবস্থান করলেও সেখানে কোভাসিকার সহজাত অঙ্কন ধারা সম্পর্কে তিনি তেমন কিছুই জানতেন না। ফলে দুটি ভিন্ন জায়গায় কৃষকের যে মহাবয়ান উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে বিষয়গত এবং পরিপ্রেক্ষিত প্রসঙ্গে মিল থাকলেও দুটি ধারাই স্বতন্ত্র।

৬.২.৩. অবয়ব

সুলতানের ছবিতে পুরুষের ফিগার দৈত্যাকার এবং পেশিবহুল, কিন্তু নারীর ফিগার গোলাকৃতির এবং সব সময় লাবণ্যময়, কিছু কিছু ছবিতে নারীও পেশিবহুল। পুরুষের চেহারায় রয়েছে হাজার বছরের ক্লান্তির ছাপ। সুলতানের ছবিতে ফিগারগুলোর মধ্যে লৈঙ্গিক পার্থক্য ছাড়া আর তেমন কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে পাশ্চাত্যে এবং আমাদের দেশের অনেক শিল্পীর কাজে এই ধরনের প্রবণতা দেখা গিয়েছে।

ম্যানচেস্টারের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লাউরির কাজে একই প্রবণতা রয়েছে। লাউরির ছবিতে উঠে এসেছে ম্যানচেস্টারের শিল্প-বিপ্লবের সময়কার মানুষের জীবন। তার ছবিগুলোতে পরিপ্রেক্ষিতগত কারণে ফিগারগুলোর আকারগত পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। তার কারণ আঠারো শতকের শিল্প-বিপ্লবের সময় যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা হাজার হাজার শ্রমিককে শুধু স্থানান্তরিতই করেনি, তাদের করেছে ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে তারা পরিচয়হীন হয়ে ওঠে। সর্বোপরি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, ব্যক্তি তার নিজস্বতা হারাতে বাধ্য হয়। সম্ভবত, সুলতানের চিত্রে একই কারণে সকল কৃষাণ-কৃষাণির চেহারা প্রায় একই রকম।

সুলতান মনে করতেন ধর্ম ও শ্রেণিবিভাজন এ অঞ্চলের মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি নিজেও ধর্ম বা শ্রেণি-বৈষম্যে বিশ্বাস করতেন না। শেষ জীবনে তিনি তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন হিন্দু ছেলে-মেয়েসহ এক বিধবা নারীকে। এসব কারণে সম্ভবত ধর্মভিত্তিক বর্ণভিত্তিক কোনো পার্থক্য ফিগারগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না। আমাদের উৎপাদনচক্রের মূল ভিত্তি যে কিষান-কিষানি তা কোনো ব্যক্তি কিষান বা কিষানি নয়। এটা এ অঞ্চলের এক সর্বজনীন বাস্তবতা। এই দর্শনই ধরা পড়েছে সুলতানের চিত্রে।

তিনি কৃষকের জীবনের বিশালতা তুলে ধরতে গিয়ে কৃষককে দৈত্যের আকৃতি দিয়েছেন। এই বিশাল ফিগারগুলি দেখে অনেকে মনে করেছেন সুলতানের শিল্পকর্মে মিকেলাঞ্জেলোর প্রভাব রয়েছে। মিকেলাঞ্জেলো রেনেসাঁকালের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের একজন। তিনি একাধারে ভাস্কর, স্থপতি ও চিত্রশিল্পী। তিনি বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাগুলোর চিত্ররূপ প্রদান করেন বিভিন্ন চ্যাপেল ও চার্চের ছাদে। সিক্সটিন চ্যাপেলের ছাদে অঙ্কিত প্রতিটি চিত্রই বাইবেলের বিশেষ মুহূর্তের ঘটনার চিত্রায়ণ এবং একটি অপরটির সাথে সরাসরি যুক্ত নয়। বাইবেলে চরিত্রগুলোর গুরুত্বের কারণেই ছাদে আঁকা ফিগারগুলো বিশাল আকৃতির নয় বরং চ্যাপেলের মেঝে থেকে দেখার আরামের জন্যই ফিগারগুলো বিশাল আকৃতির। মিকেলাঞ্জেলো অত্যন্ত শাস্ত্রীয়। এই শাস্ত্র হচ্ছে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত শাস্ত্র। আমরা পূর্বে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেছি (বিস্তারিত- ৩.১১-৩.১২), মিকেলাঞ্জেলো ছাদে চিত্র অঙ্কনের জন্য এক রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রথমে প্রতিটি চিত্রের জন্য নিচে মেঝেতে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে দেখার জন্য সেই অবস্থান সাপেক্ষে বিলীয়মান বিন্দু নির্ণয় করেছেন। সেই বিলীয়মান বিন্দু সাপেক্ষে ফিগারগুলোর আকার এবং আকৃতি দিয়েছেন। তাই, দৃষ্টিবিন্দুর সাথে সেই বিলীয়মান বিন্দু দূরত্বের উপর নির্ভর করে ফিগারগুলো আকার এবং আকৃতিতে ছোট বড় হয়েছে। সে কারণে, পুরুষ ফিগারে যতটুকু পেশি দেখা যায়, তা মূলত সুসমতা ও সৌন্দর্যের জন্যে। তাছাড়া দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখলে চিত্রগুলোর যে সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে, চার্চের অন্য কোনো অবস্থান থেকে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করা সম্ভব নয়। সুলতানের চিত্রে একরৈখিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল ব্যবহার করা হয়নি।

সুসমতার জন্য তার ফিগারগুলো বিশাল এমনও নয়; বরং তিনি সচেতনভাবে পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছেন। বাংলাদেশের কৃষকদের নানামাত্রিক শাসন-শোষণ সহ্য করেও টিকে থাকার শক্তি হচ্ছে তার মনোবল। সেই মনোবলকে উপস্থাপনের জন্য সুলতান তার ফিগারগুলোর বিশাল আকার দিয়েছেন, যা কোনো
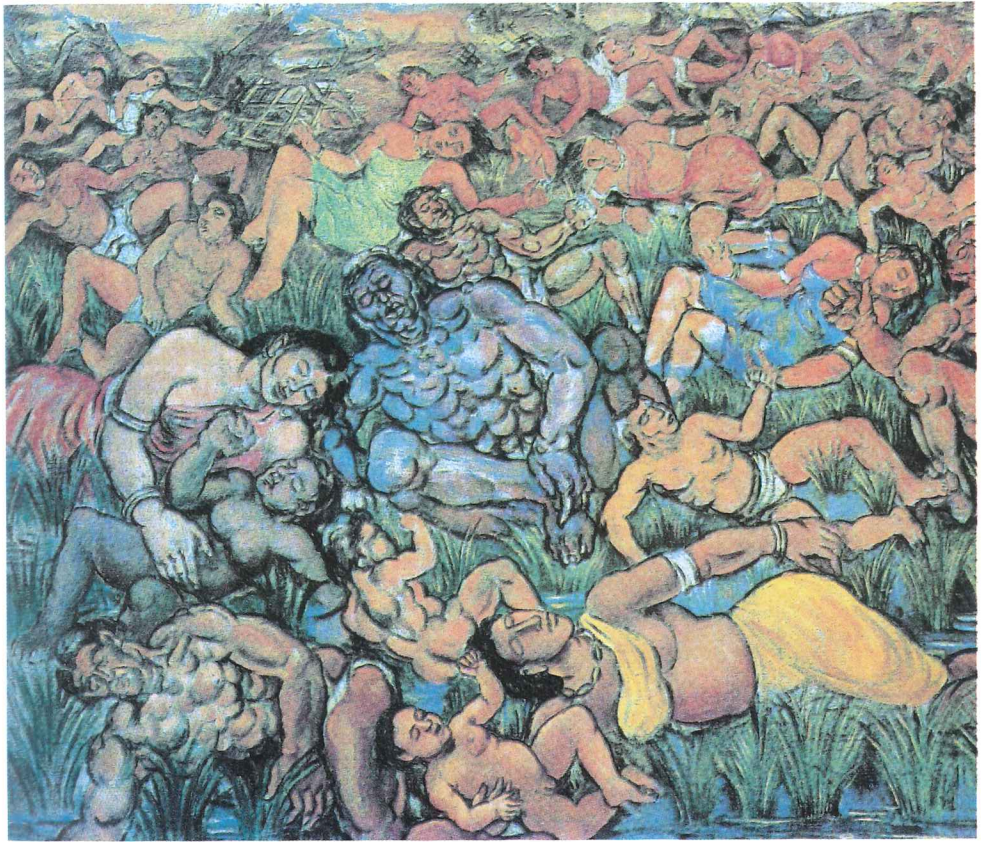
এস এম সুলতান, হত্যাযজ্ঞ, তেলরং, ১৮০×২১০ সেমি, ১৯৮৬
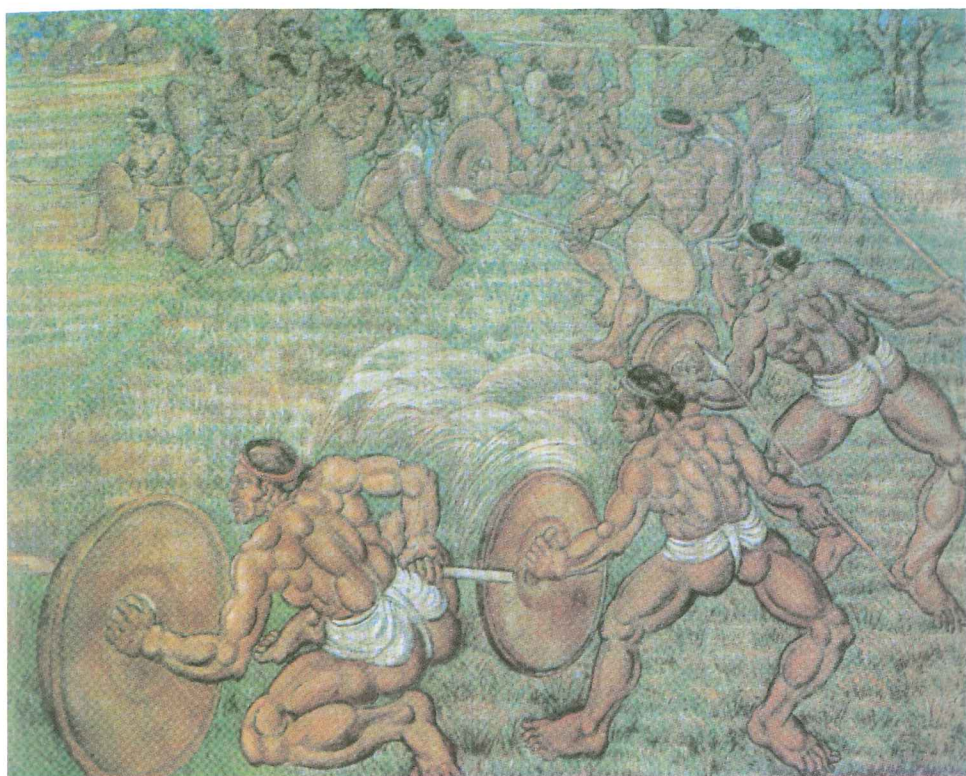
এস এম সুলতান, চর দখল, তেলরং, ১৫০×১৮০ সেমি, ১৯৮৬

এস এম সুলতান, গ্রামীন জীবন, তেলরং, ১২০×১৮০ সেমি, ১৯৮৬

ভাবেই চিত্রে থাকা ঘরবাড়ির, গাছপালার আনুপাতিক নয়। মিকেলাঞ্জেলো এই ছবিগুলো আঁকলে ঘরবাড়ি, গাছপালাকেও ফিগারগুলোর আনুপাতিক আকারে বড় করতেন এবং তিনি যদি সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদে ছবিগুলো না এঁকে ছোট ক্যানভাসে আঁকতেন তবে ফিগারগুলো কখনোই বিশাল হতো না। ফলে মিকেলাঞ্জেলো যদি শাস্ত্রচর্চার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ হন, তবে সুলতান সেই শাস্ত্র সচেতনভাবে অতিক্রম করে যাওয়া শিল্পী। তাছাড়া, মিকেলাঞ্জেলোর উদ্দেশ্য বাইবেলের কিছু ঘটনার বিশেষ মুহূর্তের চিত্রায়ণ, অন্যদিকে সুলতানের উদ্দেশ্য কৃষক জীবনের মহাবয়ান উপস্থাপন। তাই সুলতানের অনেক ছবিই সম্পূর্ণটি একসাথে দেখার প্রয়োজন নেই। অজন্তার দেয়ালচিত্রের মত সুলতানের ছবিও হাঁটতে হাঁটতে উপভোগ করা সম্ভব। কিন্তু, মিকেলাঞ্জেলোর ছবি দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখা অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অজন্তার দেয়ালচিত্রগুলো হাঁটতে হাঁটতে দেখার উদ্দেশ্যে অঙ্কন করা হয়েছিল, এবং এক দেয়ালচিত্র থেকে অপর দেয়ালচিত্রের দিকে ইঙ্গিতও রয়েছে। তবে সুলতানের চিত্রে এ ধরনের কোনো ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় না।

মিকেলাঞ্জেলোর ফিগারগুলো কিউবিক পদ্ধতিতে আঁকা, সুলতানের রেখার টান বৃত্তীয়। এমন কি সুলতানের চিত্রে বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত এবং উপবৃত্তের আকৃতি লক্ষণীয়। যদিও কোনো আদর্শ বৃত্ত দেখা যায় না তার কাজে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, আদর্শ বৃত্ত ভারতশিল্পে অত্যন্ত লক্ষণীয় এবং এ অঞ্চলের চিত্রের পরিপ্রেক্ষিত বৃত্তীয়। [বিস্তারিত- ৩.৩১৩] আদর্শ বৃত্ত না থাকায় তার অধিকাংশ ছবিই কেন্দ্রাভিমুখী নয়। অজন্তার দেয়ালচিত্রে আদর্শ বৃত্ত লক্ষ করা যায় না, কিন্তু তা কেন্দ্রাভিমুখী। প্রায়শই, অপরাপর ফিগারগুলো থেকে বুদ্ধের ফিগার বড় থাকে যার মাধ্যমে তার গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আকার, অবস্থান এবং রঙের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুলতানের চিত্রে বুদ্ধের মতো বিশেষ চরিত্র নেই, প্রতিটি মানবচরিত্রই সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। জমি, গাছপালা, ঘরবাড়ির তুলনায় সুলতান কিছু কিছু ক্ষেত্রে ষাঁড়কে বিশাল আকারে উপস্থাপন করেছেন। কৃষকের টিকে থাকার জন্য তার ষাঁড় প্রয়োজনীয়। সে সম্পর্কই তিনি উপস্থাপন করেছে ষাঁড়ের আকারের মাধ্যমে। জাদুবাস্তববাদী বা কোভাসিকার শিল্পীদের মতো তিনি শুধু রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর আকারকে ভেঙে দিচ্ছেন না, ভারতশিল্পের অভিমুখিতা রক্ষা করে বৃত্তের মধ্যে থেকে আদর্শ বৃত্তকেও ভেঙে দিচ্ছেন। তারপরও তার পরিপ্রেক্ষিত বৃত্তীয়। *হত্যাযজ্ঞ* (১৯৮৬), *চর দখল-২* (১৯৮৬) *এবং ফেরা* (১৯৯০) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

আমাদের ইতিহাস, সমাজবিদ্যা দর্শনে প্রান্তিক নারী উপেক্ষিত। সমকালীন তত্ত্ব আলোচনায় নারীকে প্রান্তিকের মধ্যেও প্রান্তিকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুলতান নারী-পুরুষের কর্মবিভাজন করলেও, লিঙ্গভেদে গুরুত্বের তারতম্য করেননি। তাই, প্রান্তিক কৃষকের ন্যায় কৃষাণিও বলিষ্ঠ। সচেতনভাবেই তার নারী অবয়ব পেশীবহুল এবং এই পেশী, পরিশ্রম ও টিকে থাকার শক্তিকে নির্দেশ করে। গবেষকদের মতে, অজন্তার দেয়ালচিত্রে নারী সগৌরবে মহিমান্বিত। এ বিবেচনায় সুলতানের নারীরূপ অজন্তাকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ্য, অজন্তায় নারীর সামাজিক অবস্থার ভেদে নারীর অবয়ব পরিবর্তিত হয়েছে যেমন প্রথম গুহায় (প্রসেনজিৎ ও সৌম্যেন, ২০১০ চিত্র-২২)। নন্দর প্রব্রজ্যাগ্রহণের দৃশ্যে রানি জনপদ কল্যাণীকে যেমন বলিষ্ঠ এবং দৃঢ়রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে সেবিকারা কোমল এবং সরু। পূর্বে উল্লেখ করেছি, অজন্তার দেয়ালচিত্রে আকার এবং রং ভেদে সে সময়কার বর্ণ এবং সামাজিক অবস্থান ইঙ্গিত করা হয়েছে। নারীর দেহ অজন্তা ও ইলোরার নারীদের আদলে আঁকা, যদিও সুলতানের নারীর বলিষ্ঠ নিতম্ব এবং উরু রয়েছে। যা আমাদের এ অঞ্চলের নারীর রূপ বলে তিনি মনে করতেন। তিনি গুপ্ত যুগের মেদশূন্য নারীর অবয়বকে আমাদের দেশজ নারীর অবয়ব মানতে নারাজ। তাছাড়া দেহের রং চয়নের ক্ষেত্রেও তিনি বাদামি রং ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করতেন, আমাদের দেহ এবং মাটির রং বাদামি।

সুলতান সচেতনভাবে নারীকে বলিষ্ঠ এবং দৃঢ়রূপ দান করেছেন, যারা হাজার হাজার বছরে ধরে নিজ পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছে। সম্ভবত, সুলতান পুরুষের পাশাপাশি নারীর মাঝে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি এবং সম্ভাবনা দেখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ *ভারতমাতা* এঁকেছেন ঔপনিবেশিক আমলে। তখন তা ভারতের ভবিষ্যৎ ভাবনা টিকে থাকার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই নারীকে সংস্কারের রক্ষাকর্তা রূপে উপস্থাপন করেছে। পাশাপাশি, অবনীন্দ্রনাথের নারী বলিষ্ঠ নয়, সক্রিয় নয়, নীরবে নিভৃতে টিকে থাকা নারী। এই সকল কারণে সুলতানের নারী পালযুগের পার্বতীর মতো রূপবতী নয়, অজন্তার সেবিকাদের মত কোমল নয়, অবনীন্দ্রনাথের নিভৃতচারী রক্ষাকর্তা রূপে নয় বরং তার নারী কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং বলিষ্ঠ।

দেয়ালচিত্র,
চতুর্থ শতক,
অজন্তা গুহা, ভারত।

এস. এম. সুলতান,
গ্রামীণ জীবন
১৯৭৬

পার্বতী,
পাথরের ভাস্কর্য
নবম-দশম শতক
উত্তর প্রদেশ, ভারত।

চিত্র-১১ নারীর অবয়ব

৬.৩. উপকরণ

ইউরোপে তেল রং অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু আমাদের দেশের পরিবেশে তা অনুপযোগী। তার কারণ তেল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাছাড়া, জয়নুল আবেদিন পাশ্চাত্যের রং ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে বলেন, বাইরের রং-এর মাধ্যমে কখনো আমাদের দেশীয় নিসর্গ উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। সে কারণে সুলতান নিজেই ভেষজ থেকে রং তৈরি করতেন। সুলতান বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছেন যার মধ্যে জলরং অন্যতম। পরে কিছুকাল তিনি তেলরংও ব্যবহার করেছেন। শেষের দিকে দেশজ বিভিন্ন উপকরণ যেমন, দেশি-গুঁড়ার রং, গাবের আঠা ও তিষির তেল প্রভৃতিকে তিনি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে তার তৈরি রং দীর্ঘ মেয়াদি নয়, এই কারণে তার তৈলচিত্র কালো হয়ে যাচ্ছে।

প্রস্তাব:

বৃত্তবাদ না ... অনেকান্তবাদ না...
...না জাতীয় শিল্প !!

The death of history, reported at the end of the twentieth century, was clearly premature. It has become a hotly contested battleground in struggles over identity, citizenship, and claims of recognition and rights. Each new national history proclaims itself as ancient and universal, while the contingent character of its focus raises questions about the universality and objectivity of any historical tradition. Globalization and the American hegemony have created cultural, social, local, and national backlashes.

SHAIL MAYARAM

সুলতান ‘অনাধুনিক’ প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে ‘আধুনিকতা’ কী এবং কখন একজন শিল্পী আধুনিক হয়ে ওঠেন? আধুনিকতার জ্ঞানতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে– সুনিশ্চিত ঐকান্তিক সত্য অনুসন্ধান, কিন্তু তার মনোভাব এর থেকে বিস্তৃত। যা সার্বিক এবং সর্বজনীন হয়ে উঠতে চায়। ইমানুয়েল কান্ট, মিশেল ফুকো প্রমুখ দার্শনিকগণ কোনো ভাবনার সার্বিক এবং সর্বজনীন করে তোলার মনোভাবকে আধুনিকতা বলেছেন। ইয়ুর্গেন হেবার্মাস অবশ্য মনে করেন আধুনিকতা শুধু মনোভাব নয়, এটি প্রকল্পও; ঐকান্তিক সত্য বিস্তারের প্রকল্প। প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজস্ব ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে সত্য এবং সার্বিক এবং সর্বজনীন দাবি করে এবং করে তুলতে চায়। তা হলে ইউরোপীয় ভাবনায় আধুনিক ভারত কিংবা আফ্রিকা কিংবা চীনের ভাবনা আধুনিক নয় কেন? ইউরোপের জ্ঞানকাণ্ড বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সে কারণে? সে ক্ষেত্রে তো স্ববিরোধিতা হবে, কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিজেই নিজেকে আপত সত্য বা প্রায়-সত্য বলে দাবি করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমস্যা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন কীভাবে সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কার্ল পপার, টমাস কুন এবং পল ফায়ারাবেন্ড। শিল্পের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা রয়েছে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি— ভারতশিল্প এবং ইউরোপীয় শিল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবতাকে উপস্থাপন। কিন্তু একটি ধারার বাস্তবতার জ্ঞান ব্যক্তিনির্ভর, অপর ধারাটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছে। এ বিবেচনায় ইউরোপীয় শিল্পে উপস্থাপিত বাস্তবতা ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক এবং এ অঞ্চলের শিল্পে উপস্থাপিত বাস্তবতা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামান্য সত্য। সে কারণে, ইউরোপীয় মূলধারার শিল্প বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, ভারতীয় শিল্প আদর্শনির্ভর। এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কিন্তু হ্যাভেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ ভেবেছেন ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা। যদিও ভারতশিল্পের বহুল চর্চিত বিষয় আধ্যাত্মিকতা, কিন্তু এ অঞ্চলের শিল্পে একই ভাবে উঠে এসেছে, সাধারণ মানুষের জীবন এবং সংস্কৃতি, সম্রাট অথবা রাজাদের জীবন এবং দরবার। এমন কি আধ্যাত্মিকতাও এখানে প্রকাশ করা হয়েছে বাস্তব অবয়বের মাধ্যমে। তা স্পষ্ট হয়, যখন আমরা উত্তম নবতাল মানব আকৃতিকে ভিত্তি করে প্রতিমা তৈরি করতে দেখি। এই নবতাল মানবদেহের অঙ্গসমূহের আনুপাতিক আকার এবং তার সাথে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অঙ্কিত মানব-আকৃতির আনুপাতিক মিল রয়েছে।

হ্যাভেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পের পাঠ রাজনীতি-নিরপেক্ষ নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য, প্রতিরোধের জন্য ঐক্য প্রয়োজন কিন্তু ভারতবর্ষে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণ-শ্রেণি-ভাষা-সংস্কৃতির মানুষ। তাদের এক ছাতার নিচে আনতে হলে

প্রয়োজন সামষ্টিক পরিচয় নির্মাণ। এই সামষ্টিক পরিচয় নির্মিত হয়েছে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির আত্মপরিচয়ের প্রতিষেধ করে। ইউরোপীয় 'বস্তুবাদী' এবং 'যুক্তিবাদী' চরিত্রের বিপরীতে ভারতের চরিত্র নির্ধারিত হয়েছিল 'অধ্যাত্ম'। যার প্রভাব পড়েছিল শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ভাষাসহ জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই 'অধ্যাত্ম' শুধু ভারতের নয় সম্পূর্ণ প্রাচ্যের পরিচয়। যা প্রাচ্যতত্ত্বের ভিত্তিও। কিন্তু এই নির্মিত বিরোধাভাসী আত্মপরিচয় ইউরোপকে বিচ্ছিন্ন করেছে বহির্বিশ্ব থেকে; তেমনি ভারতকে পুনরায় আত্মসত্তা থেকে বিচ্ছেদ করেছে। ইউরোপ আজও এই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করতে পারেনি, তেমনি অধ্যাত্মের নামে যে ধর্মীয় রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছিল, তা আজও সক্রিয় এ অঞ্চলে।

সুলতানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সুলতানের মূল সম্পদ। প্রান্তিক পরিবারে জন্ম ও বড় হয়ে উঠার কারণে মূলধারার লৌকিক সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক। মধ্যবয়সে শহরের জীবন এবং কিছু কাল বিদেশে ভ্রমণের কারণে তার ভাবনাজগতের ক্ষেত্রভূমি হয়ে ওঠে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক। তিনি যেমন উপনিবেশের প্রভাব নিয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন তেমনি বিউপনিবেশায়নের ভিত্তি হিসেবে লৌকিক সংস্কৃতির সাথে ছিল তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে তার শিল্পের বিষয় কৃষক জীবনের মহাবয়ান। অন্যথায়, বঙ্গীয় পুনর্জাগরণবাদের আধ্যাত্মিকতানির্ভর আত্মসত্তান্বেষণের কারণে যে পুনঃবিচ্ছেদায়ন ঘটে তা আমাদের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। সুলতানের শিল্পকর্মে আত্মসত্তার অন্বেষণ ও আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রকৃতপক্ষে বি-বিচ্ছেদায়নেরই একটি প্রস্তাব। একই সাথে তা ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডেরও একটি প্রতিবয়ান। সুলতানের বিউপনিবেশায়নের উদ্দেশ্য প্রাক-ঔপনিবেশিক মননে ফিরে যাওয়া নয়। তিনি মনে করতেন, প্রাক-ঔপনিবেশিক মননের সৃষ্টিশীল বৈশ্বিক রূপান্তরই হচ্ছে বিউপনিবেশায়ন।

বাংলাদেশ কখনো বৈশ্বিক রাজনীতি এবং অর্থনীতির কেন্দ্র ছিল না। এমনকি '৭১-এর স্বাধীনতার পরও এটা বিশ্বের এক প্রান্তিক রাষ্ট্রই রয়ে যায়। সে কারণে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চা, সাহিত্য, শিল্পকলা বিভিন্নভাবে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সুলতান তাই বাংলাদেশের আত্মসত্তার অন্বেষণ করেছেন। তিনি রাষ্ট্র নির্মাণের সম্ভাবনা দেখেছেন লোকজ সংস্কৃতিতে, যা ভিত্তি হতে পারে বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বের এবং টেকসই উন্নয়নের। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পরসিকদের অনেকেই পশ্চিমা চোখে দেখার কারণে সুলতানকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার কাজের বিষয়বস্তুতে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিবয়ান থাকলেও, আঙ্গিক ও উপকরণগত দিক থেকে তিনি ঔপনিবেশিক শিল্পকৌশলকে মাড়িয়ে গেছেন। তিনি যে

শিল্পকৌশল ব্যবহার করেন তা শাস্ত্রনির্ভর নয় কিন্তু তাতে ভারতশিল্পের ঐতিহাসিক অভিমুখিতা বর্তমান। সুলতানের এই অসাধারণ সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম, শিল্পরসিকদের কাছে ধরা পড়েছে অনাধুনিক রূপে। কিন্তু পাশ্চাত্য এবং ভারতশিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণার পার্থক্যের কারণে এই দুই ধারা দুই দিকে অগ্রসর হয়েছে; তা হলে একটি কেন আধুনিক অপরটি কেন নয়? তা ছাড়া বিশশতকে ইউরোপীয় শিল্প প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনের ব্রত ত্যাগ করেছে। অথচ, শিল্প সর্ম্পকে প্রাক-বিশ শতকের ধারণা এখনও বংলাদেশে ক্রিয়াশীল, তার কারণ ঔপনিবেশিক হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কারণে তাদের উদ্দেশ্যে গার্ফিল্ড বলেন পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি অঞ্চলের শিল্পরসিকদের শিল্পরস উপভোগ করার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে, তাই তাদের প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন [Bhushan and Garfield, 2011: xix]। আর সেটা সম্ভব হলেই সুলতানসহ অন্য শিল্পীদের শিল্পকর্মও যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

কিন্তু আত্মসত্তার অন্বেষণ রাজনীতিমুক্ত নয়, এবং তা ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে আলোচনা সম্ভব নয়। তারপরও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো আত্মসত্তার অন্বেষণ এবং আত্মপরিচয় নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করতে পারে না। বিশেষত উপনিবেশোত্তর পর্বে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন আত্মসত্তার অন্বেষণ এবং আত্মপরিচয়ের নির্মাণ এমনটাই মনে করেন সাইল মায়ারাম। কিন্তু সেই আত্মসত্তার অন্বেষণ এবং আত্মপরিচয় নির্মাণে বিচারমূলক আলোচনা জারি রাখা প্রয়োজন। সুলতানের শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্যকে বাংলাদেশের জাতীয় শিল্পের সামান্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করলে চিত্রশিল্প পোশাকশিল্পে পরিণত হবে, এতে করে বাংলাদেশের শিল্প চিহ্নিত করা যাবে কিন্তু সৃষ্টিশীলতা হারাবে। তা ছাড়া অভিমুখিতা রক্ষা করে প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্পের বৈশ্বিক রূপান্তরই বিউপনিবেশায়ন। অন্যথায় জাতীয় শিল্পের চাপে অনেক প্রতিভা হারিয়ে যাবে। বিশেষ তত্ত্বের আলোকে সমকালীন কাজের অবকাশ রয়েছে। বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার বা অনেকান্তিক পরিপ্রেক্ষিত কৌশল বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ধারা হতে পারে। তবে আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত, চাপিয়ে দেয়া ঔপনিবেশিক শাস্ত্র যেমন এ অঞ্চলের শিল্পের বিকাশকে রুদ্ধ করেছে, ঠিক তেমনি জাতীয় শিল্পের ধারণা একই সংকট তৈরি করতে পারে। সে কারণে এ অঞ্চলের শিল্পের অভিমুখিতা বজায় রেখে শিল্পের বিচিত্র বিকাশ ঘটতে পারে। তাই বিউপনিবেশিত শিল্পচর্চা নিয়ে শুক্রাচার্য হয়তো বলতেন—

অভিমুখিতাসম্পর্ণম্ শাস্ত্রমানবিহীনং শিল্পম্ হি বিউপনিবেশিতশিল্পম্।।

[বিউপনিবেশিত শিল্প হচ্ছে অভিমুখিতা সম্পর্ণ শাস্ত্রমান নির্ভর নয় এমন শিল্প।]

পরিশিষ্ট

শিল্প বিষয়ক সংস্কৃত সূত্র সাহিত্যের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। গুপ্ত যুগের প্রথম দিকে নগ্নজিৎ রচনা করেন *চিত্রলক্ষণ* এবং বাৎসায়নের *কামসূত্র*। গুপ্ত যুগের শেষের দিকে রচিত হয় *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ* এবং বরাহমিহিরের *বৃহৎ সংহিতা*। পরবর্তীকালে, আনুমানিক চতুর্দশ শতকে বেদান্ত দার্শনিক মাধবাচার্য *পঞ্চদশী* নামে একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন ।

চিত্রলক্ষণ-এর মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি পাওয়া যায়নি। ১৯১৩ সালে জার্মান গবেষক বার্থহোল্ড লডিফার *চিত্রলক্ষণ* গ্রন্থটি তিব্বতীয় ভাষা থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৭ সালে অশোক চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটি তিব্বতীয় ভাষা থেকে ইংরেজি ও সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। মূল সংস্কৃত না থাকায় ভাষা দেখে কাল নির্ণয় সম্ভব হয়নি। কিন্তু *বৃহৎ সংহিতায় চিত্রলক্ষণের* নাম উল্লেখ রয়েছে এবং *বৃহৎ সংহিতা* আনুমানিক ৫৫০ সালে রচিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, গুপ্ত যুগের প্রথম পর্যায়েই *চিত্রলক্ষণ* রচিত হয়েছে।

চিত্রকলা বিষয়ে সবচেয়ে পঠিত এবং আলোচিত গ্রন্থ *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ*। তার রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে ধারণা করা হয়ে থাকে গুপ্ত যুগের শেষের দিকে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। আকবরের সময় লিখিত *বিষ্ণুধর্মোত্তরের* একটি সংস্করণ পাওয়া যায়, যা ১৯২৪ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। পারুলদেব মুখার্জি নেপাল এবং বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত আরো দুটি সংস্করণের আলোকে ২০০১ সালে পুনরায় *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ*-এর একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। *চিত্রলক্ষণ*, *বৃহৎ সংহিতা* এবং *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে* মানবদেহের আনুপাতিক আকার নিয়ে আলোচনা রয়েছে; তবে তাদের মধ্যে মানবদেহের আনুপাতিক পরিমাপ নিয়ে কিছু মতবিরোধ রয়েছে। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে* দেহের আনুপাতি আকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকায় *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের* উপর নির্ভর করে পূর্ণাঙ্গ দেহের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। চিত্রটি অঙ্কন করেছেন মিতুল মাহমুদ।

পূর্ণাঙ্গ দেহ

		বিষ্ণুধর্মোত্তর		বৃহৎ সংহিতা		চিত্রলক্ষণ	
	অঙ্গ	আঙুল	তাল	আঙুল	তাল	আঙুল	তাল
ক	মস্তক থেকে চুলের গোড়া	২		২২		৩	
খ	মুখমণ্ডল		১		১		১
গ	গলা	৪		-		৪	
ঘ	গলা থেকে হৃদয়		১		১		১
ঙ	হৃদয় থেকে নাভি		১		১		১
চ	নাভি থেকে লিঙ্গ		১		১		১
ছ	উরু		২		২		২
জ	হাঁটু	৩		৪		৪	
ঝ	অগ্রপদ		২		২		২
ঞ	গোড়ালি	৩		৪		৪	

১. পূর্ণাঙ্গ দেহ

	অঙ্গ	আঙুল	তাল
ক	মস্তক থেকে চুলের গোড়া	২	
খ	মুখমণ্ডল		১
গ	গলা	৪	
ঘ	গলা থেকে হৃদয়		১
ঙ	হৃদয় থেকে নাভি		১
চ	নাভি থেকে লিঙ্গ		১
ছ	উরু		২
জ	হাঁটু	৩	
ঝ	অগ্রপদ		২
ঞ	গোড়ালি	৩	
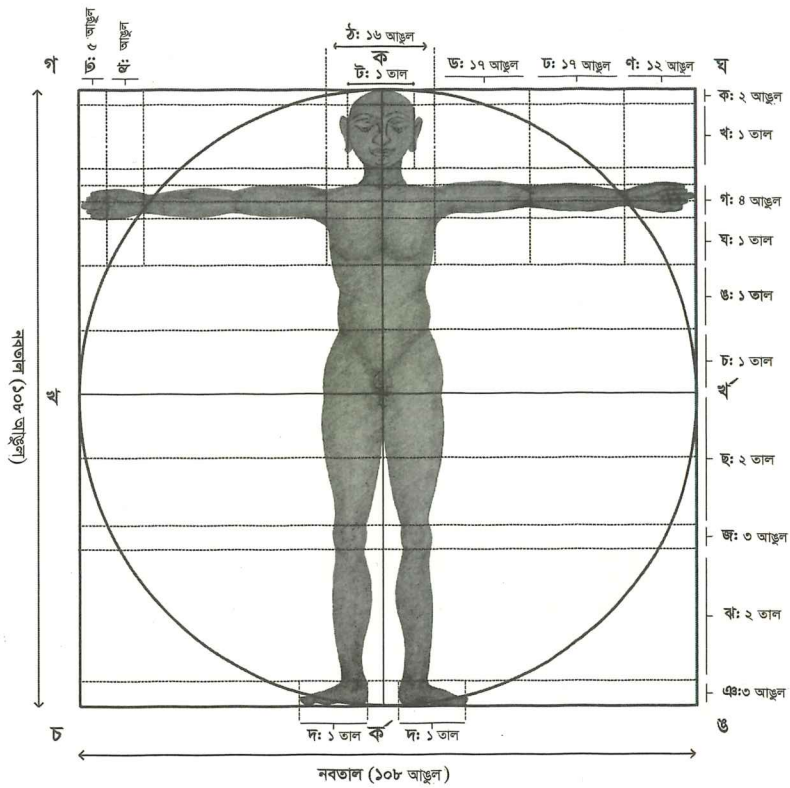
পূর্ণাঙ্গ দেহ
উত্তম নবতাল

২. চরণ

	অঙ্গ	আঙুল	তাল
ক	চরণ		১
খ	গোড়ালি	৪	
গ	গোড়ালি (প্রস্থ)	৩	
ঘ	বুড়ো আঙুল	৩	
ঙ	অপর আঙুল যথাক্রমে	৩, ২ .৭/৮,২.৩/৪,২৫/৪	
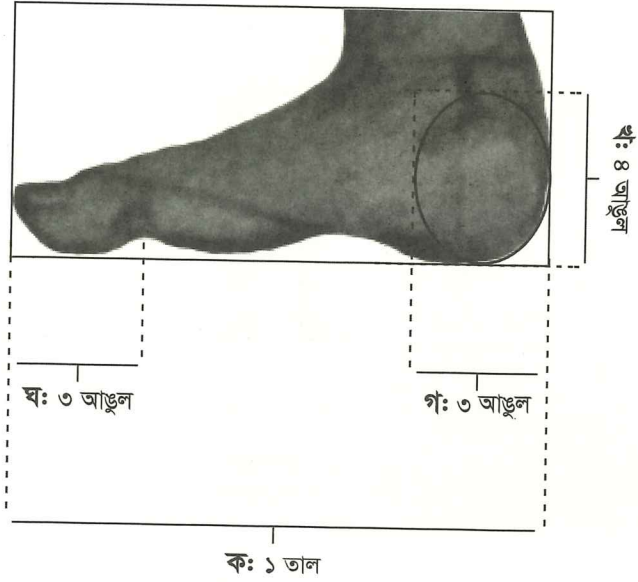
চরণ
১ তাল

৩. মুখমণ্ডল

	অঙ্গ	আঙুল	তাল
ক	মুখমণ্ডল (প্রস্থ)		১
খ	মুখমণ্ডল (দৈর্ঘ্য)		১
গ	মস্তক থেকে চুলের গোড়া	২	
ঘ	কপাল (প্রস্থ)	৩	
ঙ	কপাল (দৈর্ঘ্য)	৪	
চ	চোখ (দৈর্ঘ্য)	৩	
ছ	ভুরু (দৈর্ঘ্য)	৩	
জ	ভুরু (প্রস্থ)	৬/৮	
ঝ	দুই ভুরুর দূরত্ব	২	
ঞ	চোখ (ব্যাস রেখা)	১	
ট	চোখের পুতলি (ব্যাস রেখা)	১/২	
ঠ	কান (প্রস্থ)	২	
ড	কান (দৈর্ঘ্য)	৪	
ঢ	কানের মধ্যাংশ	১	
ণ	নাক (দৈর্ঘ্য)	৪	
ত	নাক (ঊর্ধ্বভাগ)	২	

থ	নাক (সম্মুখ ভাগ)	২	
দ	নাকের এক পাশ	১	
ধ	ঠোঁট এবং নাকের দূরত্ব	১/২	
ন	মুখগহ্বর (প্রস্থ)	৪	
প	ওপরের ঠোঁট	১	
ফ	নিচের ঠোঁট	১	
ব	চিবুক (দৈর্ঘ্য)	৪	
ভ	চিবুক (প্রস্থ)	২	
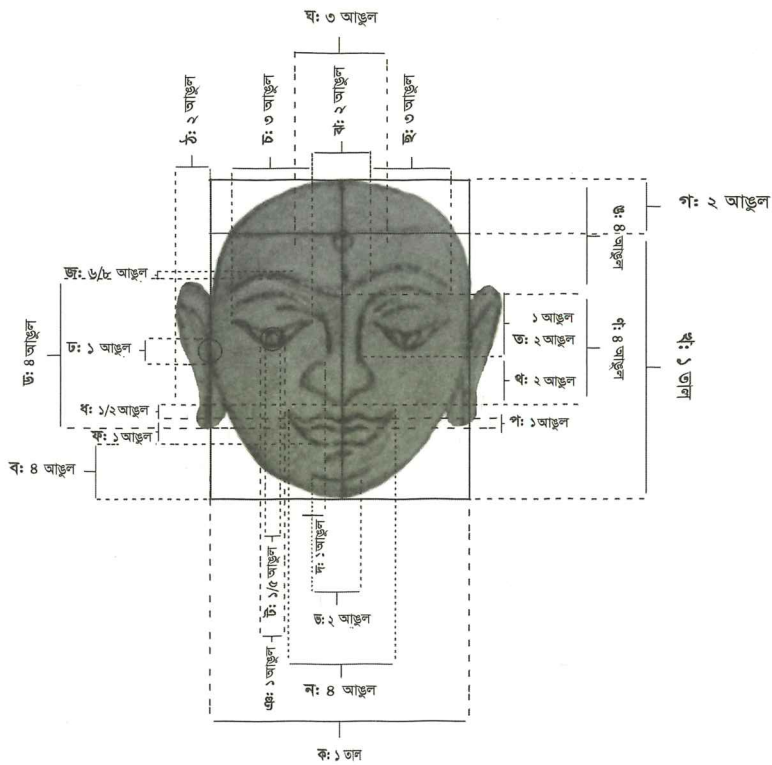
মুখমণ্ডল
১ তাল × ১ তাল

৪. দেহ (নাভীর উর্ধ্বাংশ)

	অঙ্গ	আঙুল	তাল
ক	বুক (প্রস্থ)	১৬	
খ	গলা (প্রস্থ)	৬	
গ	বুক থেকে নাভি		২
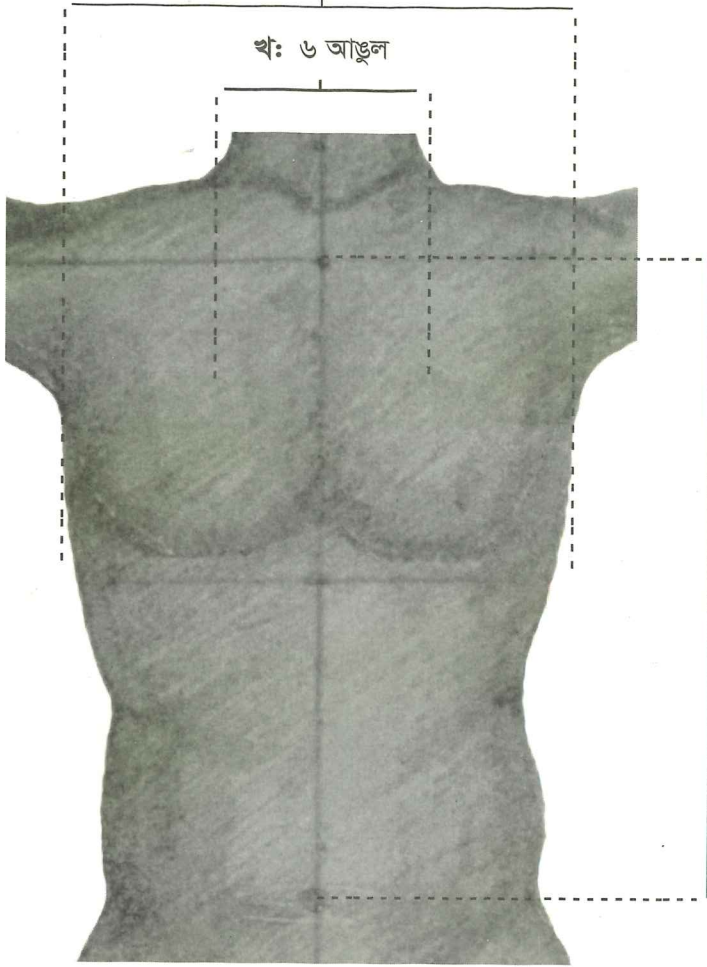
দেহ (উর্ধ্বাংশ)
২ তাল X ১৬ আঙুল

৫. দেহ (নাভির নিম্নাংশ)

	অঙ্গ	আঙুল	তাল
ক	শ্রোণী (প্রস্থ)	১৮	
খ	নাভি (ব্যাস রেখা)	১	
গ	লিঙ্গ (দৈর্ঘ্য)	৬	
ঘ	অণ্ডকোষ (প্রস্থ)	৪	
ঙ	ঊরু		২
চ	হাঁটু (দৈর্ঘ্য)	৩	
ছ	হাঁটু (প্রস্থ)	৪	
জ	হাঁটু থেকে চরণ		২
ঝ	অগ্রপদ-মধ্যাংশ (দৈর্ঘ্য)	৬	
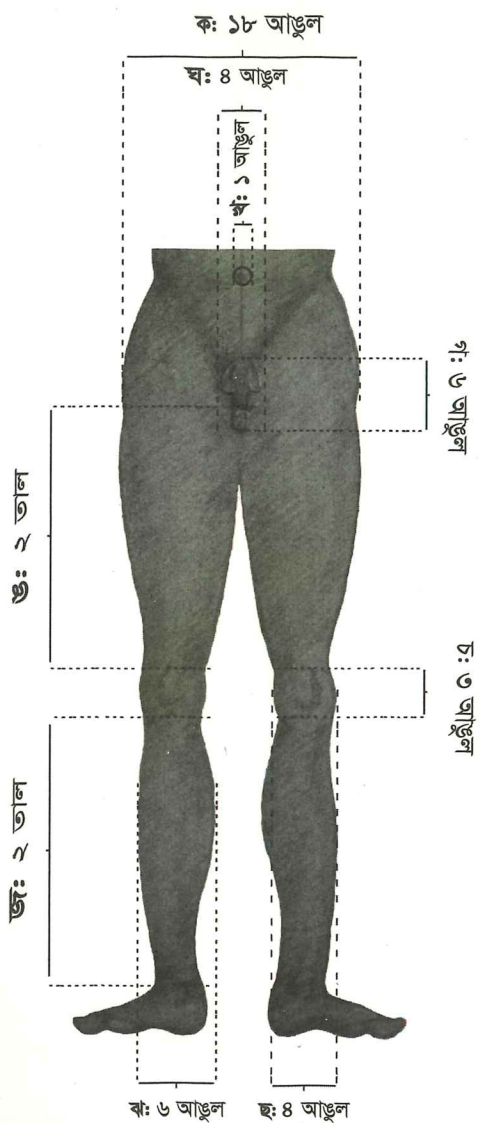
দেহ (নিম্নাংশ)
৫৪× ১৮ আঙুল

৬. হাত

	অঙ্গ	আঙুল	তাল
ক	সম্পূর্ণ হাত	৪৬	
খ	ঘাড় থেকে কনুই (দৈর্ঘ্য)	১৭	
গ	কনুই থেকে করতল (দৈর্ঘ্য)	১৭	
ঘ	আঙুলসহ করতল (দৈর্ঘ্য)	১২	
ঙ	করতল (দৈর্ঘ্য)	৭	
চ	করতল (প্রস্থ)	৫	
ছ	মধ্যমা	৫	
জ	অঙ্গুষ্ঠ	৩	
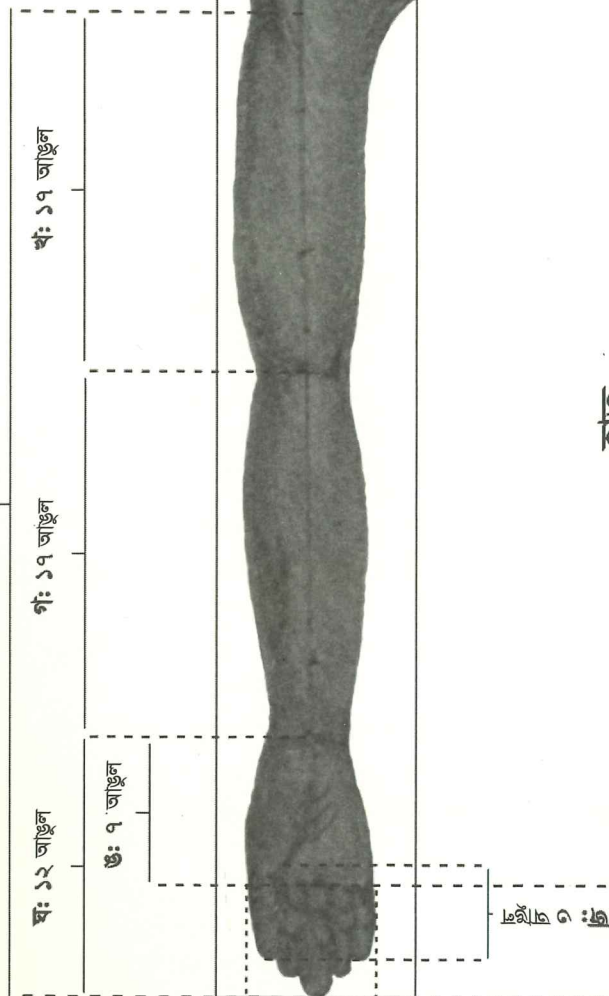
হাত
৪৬×৫ আঙুল

সহায়কপঞ্জি

অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৫	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- , ২০১২(১)	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধনিচয়* (প্রথম ভাগ), কলকাতা: দীপায়ন।
- , ২০১২(২)	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধনিচয়* (দ্বিতীয় ভাগ), কলকাতা: দীপায়ন।
অশোক , ২০১১	অশোক মিত্র, *ছবি কাকে বলে*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
অসিতকুমার, ১৯১৩	অসিতকুমার হালদার, *অজন্তা*, (পুনপ্রকাশিত) প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌম্যেন পাল সম্পাদিত (২০১০) কলকাতা: লালমাটি।
আবদুল, ২০০৮	আবদুল হাই, *সুলতান*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
আমিনুল, ২০০৩	আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।
আহসান, ২০০৪	সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।
কালিদাস,১৯৮৮	কালিদাস, কালিদাস রচনাসমগ্র, সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (অনু), কলকাতা: তুলি-কলম।
গৌতম, ১৯৯৪	গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান*, কলকাতা: সুবর্ণরেখা।
ছফা, ১৯৯৫	আহমদ ছফা, 'অভিনব উদ্ভাসন', সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), *এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ৮৬-১০৫ ।
তাহের , ২০০৮	আবু তাহের, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী (জয়নুল আবেদিন, এস. এম. সুলতান ও রশিদ চৌধুরী)*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।
দেবপ্রসাদ, ১৯৮৬	দেবপ্রসাদ ঘোষ, *ভারতীয় শিল্পধারা* (প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত), কলকাতা: সাহিত্যলোক।

দেবীপ্রসাদ , ২০০৭	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *রূপ, রস ও সুন্দর: নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা*, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশন।
নজরুল, ২০০৯	নজরুল ইসলাম, *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।
নন্দলাল, ২০০৮	নন্দলাল বসু, *শিল্প চর্চা*, কলকাতা: বিশ্বভারতী।
নরহরি, ১৯৯৭	নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), *ঊনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ: তর্ক ও বিতর্ক*, কলকাতা: কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী।
নিজার, ২০১৩	সৈয়দ নিজার, 'যুক্তির উপনিবেশিকরণ' in *The Jahangirnagar Review*, Part-C, Vol. XXIV,pp 199 -210.
ফনিভূষণ, ২০০৩	ফনিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায় দর্শন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ।
বঙ্কিম,-	বঙ্কিমচন্দ্র, *'আর্য্যজাতি সূক্ষ্ম শিল্প'*, বঙ্কিম রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড), অনলাইন সংস্করণ।
বিষ্ণুপুরাণ,-	*বিষ্ণুপুরাণ*, রবীন্দ্রনাথ কর্মকার (ভাষান্তর), অশোক চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.), ১৯৮৭, কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন।
বোরহানউদ্দিন, ১৯৯৫	বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'দেশজ ও আধুনিকতা: সুলতানের কাজ', সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), *এস এম সুলতান স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ২৩-৪৯।
মণীন্দ্রভূষণ, ২০১২	মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
মাধব, ২০০৫	সায়ন মাধব, *সায়ন মাধবীয়ঃ সর্বদর্শন সংগ্রহঃ*, মঁহেশচন্দ্রপাল (ভাষান্তর), শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা: শ্রীবলরাম প্রকাশনী।
মতলুব, ১৯৯৫	মতলুব আলী, 'সুলতান: তাঁর জীবন, কথা ও কাজ', সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), *এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ১৩৩-১৪৭।

মনসুর (১৯৯৫)	আবুল মনসুর, 'এস এম সুলতান: সৃজনশীলতা ও প্রান্তিক মানসের দায়', সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী (সম্পা.) *এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ১৬৬-১৮৬।
মনজুরুল ও সুবীর ১৯৯৫	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), *এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ১৩৩-১৪৭।
রণজিৎ, ২০০১	রণজিৎ গুহ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', *গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)*, নিম্নবর্গের ইতিহাস, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- ,২০১০	রণজিৎ গুহ, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত*, কলকাতা: তালপাতা।
রাজ্জাক, ১৯৯৫	আবদুর রাজ্জাক, 'সুলতানের ছবি', *সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী (সম্পা.) এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ১৩-১৪।
শামসুর, ১৯৭৬	শামসুর রাহমান, *রৌদ্র করোটিতে*, চট্টগ্রাম: বইঘর।
শাহাদুজ্জামান, ১৯৯৪	শাহাদুজ্জামান, *সুলতানের সাথে আলাপ* (শিল্পী এস এম সুলতানের সাক্ষাৎকার), ঢাকা: নৃ সিরিজ।
সাদেক, ২০০৩	সাদেক খান, *এস. এম. সুলতান*, সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।
সুরেন্দ্রনাথ, ২০০৪	সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।
Aristotle , 1997	Aristotle, *Poetics*, George Whalley (tr.), Montreal: McGill-Queen's University Press.
Ashcroft, Griffiths, & Tiffin, 2007	Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin (eds.) *The Post-Colonial Studies Reader*, 2nd edition, London and New York: Routledge.

Ashis, 1989 — Ashis Nandy, *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under colonialism*, Delhi: Oxford University Press.

Aurobindo, 1918 — Aurobindo Ghosh, 'The Renaissance in India' reprinted in Nalini Bhushan and Jay L. Garfield (eds.) (2011) *Indian Philosophy in English: From Renaissance to Independence*, London: Oxford University Press.

Benoytosh, 1958 — Benoytosh Bhattacharyya, *The Indian Buddhist Iconography*, Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay.

Bhabha, 1994 — Homi K. Bhabha, 'The Mimicry and The Man' in *The Location of Culture*, London: Routledge.

Bhushan & Garfield, 2011 — Nalini Bhushan and Jay L. Garfield (eds.), *Indian Philosophy in English: From Renaissance to Independence*, London: Oxford University Press.

Blacker, 1922 — J. K. Blacker, *The A B C of Indian Art*, London: Stanley Paul & Co.

Boner, 1993 — Alice Boner, *Diaries: India 1934-1967*, G. Boner, L. Soni and J. Soni (eds.), Delhi: Motilal Banarsidass Publication.

-, 1962 — Alice Boner, *Principles of Composition in Hindu Sculptures*, Leiden: E. J. Brill Publication.

Bowers, 2004 — M. A. Bowers, *Magic(al) Realism*, London: Routledge.

Brown, 1918 — Percy Brown, *The Heritage of India: Indian Painting,* Calcutta: The Association Press.

Bryant & Patton, 2005 — Edwin F. Bryan and Laurie L Patton (eds.), *The Indo-Aryan Controversy: Evidence and Inference in Indian History*, London: Routledge.

Blair &Bloom, 994 — Sheila S. Blair & Jonathan M. Bloom *The Art and Architecture of Islam, 1250–1800*, New Haven: The Yale University Press.

Carpentier, 1975 [1949] — Alejo Carpentier, *The Kingdom of this World*, Harriet de Onis (tr.), Middlesex: Penguin.

- , 1995 [1949] — Carpentier, Alejo '*On the Marvelous Real in America'*, Tanya Huntington and Lois Parkinson Zamora (tr.), in L. P. Zamora and Wendy B. F. (eds) *Magical Realism: Theory, History, Community*, Durham, NC London: Duke University Press, pp. 75–88.

Chatterjee, 1995 — Partha Chatterjee, *Texts of Power: Emerging Disciplines In Colonial Bengal* Minneapolis: University of Minnesota Press.

-, 1998 — Partha Chatterjee, *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism*, Oxford (India): Oxford University Press.

Coomaraswamy, 1910 — Ananda Coomaraswamy, 'Art and Swadeshi' reprinted in Nalini Bhushan and Jay L. Garfield (eds.) (2011) *Indian Philosophy in English: From Renaissance to Independence*, London: Oxford University Press.

-, 1924 — Ananda Coomaraswamy, *Visvakarma Examples Of Indian Architecture, Sculpture, Painting, Handicraft,* London; Messer Luzac.

Cooper, 2005 — Frederik Cooper, *Colonialism In Question; Theory, Knowledge, History,* Berkeley: University of California Press.

Cotter, 2008	Holland Cotter, '*Indian Modernism via an Eclectic and Elusive Artist*', in Newyork Times.
Dalrymple, 2015	William Dalrymple, 'The East India Company: The original corporate raiders', in The Guardian Newspaper
Dalrymple, 200	William Dalrymple, 'That's magic', in *The Guardian Newspaper*.
Dhar, 2006	Parul Panday Dhar, *Indian art history: changing perspectives*, New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd.
Fanon, 1963	Frantz Fanon, *The Wretched of The Earth*, Constance Farrington (tr.), New York: Grove Press.
Gautama, 1936	Aksapada Gautama, *Nyaya-Sutra*, Taranatha Nyayatarkatirth and Amarendramohan (eds.), Calcutta: Calcutta Sanskrit Series No. 18-19.
Guha, 1988	Ranajit Guha, *An Indian Historiography of India: A nineteenth-Century Agenda and its Implication*, Calcutta: K P Bagchi & Company.
Guha-Thakurta, 1992	Tapati Guha-Thakurta, 'Images of Nationalism and Modernity: The Reconstruction of "Indian" Art in Calcutta at the Turn of the Century' in *Modernisation of Culture and the Development of Political Discourse in the Third World*, Occasiobal Paper No. 5, Roskilde: Roskilde University.
-, 2004	Tapati Guha-Thakurta, *Monuments, Objects, Histories: institutions of art in colonial and postcolonial India*, New York: Columbia University Press.
Havell, 1908	E. B. Havell, *Indian Sculpture and Painting*, London: Johan Murryay.

-,1913 E. B. Havell, *Indian Architecture: Its Psychology, Structure and History from the first Muhammadan Invasion to the Present day*, London: Johan Murryay.

-,1920 E. B. Havell, *The Ideals of Indian Art*, London: Johan Murryay.

Hegerfeldt, 2005 A. C. Hegerfeldt *Lies Tell the Truth: Magic Realism Seen through Contemporary Fiction from Britain*. Amsterdam: Rodopi.

Jones, 1799 William Jones, 'The Third Anniversary Discourse on the Hindus', Delivered 2 February, 1786,' in *The Works of Sir William Jones*, vol. I, London: Robinson and Evans, as given in Lehmann, Winfred P., 1967. *A Reader in Nineteenth Century Historical Indo-European Linguistics*, Indiana University Press, pp. 7-20.

Kedar, 2010 Vishwanathan Kedar, 'Aesthetics, Nationalism and the Image of Woman in Modern Indian Art' in *Comparative Literature and Culture,* vol. 12.2.

Kopf, 1969 David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835*, University of California Press, Berkley and Los Angeles.

Loomba, 2001 Ania Loomba, *Colonialism/Postcolonialism,* London: Routledge.

Lyotard,1984[1979] Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Geoff Bennington and Brian Massumi (tr.), Theory and History of Literature 10, Manchester: Manchester University Press.

Macauley, 1835 — Thomas B. Macauley, Minute on Education Columbia University. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html

Mccarthy& Dimitriadis, 2000 — Cameron Mccarthy and Greg Dimitriadis, 'Art and the Postcolonial Imagination: Rethinking the Institutionalization Third World Aesthetics and Theory', in *A Review of International English Literature*, 31:1&2, Jan.- Apr.

Mcleod, 2007 — John McLeod, *Beginning Postcolonialism*, Manchester: Manchester University press.

Michalski, 1994 — Sergiusz Michalski, New *Objectivity: Painting, Graphic Art and Photography in Weimar Germany, 1919–1933*, Cologne: Benedikt Taschen.

Nayar , 2008 — Pramod K. Nayar, *English Writing and India 1600–1920: Colonizing aesthetics*, London: Routledge.

Nicholas, 1994 — Thomas Nicholas, *Colonialism's Culture*, UK: Polity Press.

Roe, 1958 [1631] — Thomas Roe, *The Embassy of Sir Thomas Roe To India, 1615— 1619,* vol. II. London: The Hakluyt Society.

Said, 1995[1978] — Edward Said, *Orientalism*, New York: Penguin Books.

Sarkar, 1997 — Sumit Sarkar, *Writing Social History*, Oxford University Press, New Delhi.

-, 2000 — Sumit Sarkar, *A Critique of Colonial India*, Calcutta: Papyrus.

Shail, 2004 — Shail Mayaram, *Against History, Against State: Counterperspectives from the Margins*, Columbia: Columbia University Press.

Stokes, 1990 — Eric Stokes, *The English Utilitarians and India*, New Delhi and Oxford: Oxford University Press.

Thiong'o, 2007 — Ngugi Wa Thiong'o *Decolonising the Mind*, Worldview Publications, Delhi.

Tucker, 1975 — Robert Tucker (ed.), *The Marx-Engels Reader* (2nd Edition), New York: Princeton University Press.

Vasari,1912 — Giorgio Vasari, *Lives of The Most Eminent Painters Scluptores & Architects*, Gaston Du C. De Vere (tr.), London: Macmillan and Co.

Vatsyayana,- — Vatsyayana, *Nyaya-Sutra-Bhasya*, Taranatha Nyayatarkatirth and Amarendramohan (eds.) 1936, Calcutta: Calcutta Sanskrit Series No 18-19.

Vatsyayana,- — Vatsyayana, The Complete Kama Sutra, Alain Danielou (tr.), India: Inner Traditions India.

Verma, 2009 — Som PrakashVerma, *Interpreting Mughal Painting: Essays on Art, Society and Culture*, Oxford: Oxford University Press.

Vinci, 2008[1952] — Leonardo Da Vinci, *Notebooks*, Thereza Wells (ed.), Oxford: Oxford University Press.

Vishnudharmottara,- — *The Vishnudharmottara (Part III): A Treatise on Indian Painting and Image-Making*, Stella Kramrisch (tr.) 1928, Calcutta: Calcutta University Press.

Vitruvius,- — Vitruvius, *The Ten Books On Architecture*, Morris H. Morgan (tr.)1914, Cambridge: Harvard University Press.

Young, 2003 — Robert J. C. Young, *Postcolonialism: A very Short Introduction*, London: Oxford University Press.

Zimmer, 1955 — Heinrich Zimmer, *The Art of Indian Asia*, Joseph Campbell (ed.), New York: Pantheon Books.

নির্ঘণ্ট

আলোকচিত্রী : ডানকান শ ব্রাউন

সৈয়দ নিজার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার দর্শনপাঠ ও চর্চার হাতেখড়ি ঢাকায় থাকা অবস্থায় হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানে যৌথভাবে স্নাতক। পরবর্তীকালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ থেকে গাণিতিক যুক্তিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। বিউপনিবেশিত জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণ তার অন্যতম দার্শনিক প্রকল্প। তার গবেষণার বিষয় বহুমাত্রিক। তিনি গবেষণা করেছেন যুক্তিবিদ্যা, ভাষাদর্শন, নন্দনতত্ত্ব এবং বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে। তিনি এ অঞ্চলের যুক্তিতত্ত্বকে গাণিতিক ক্যালকুলাসে রূপান্তরের কাজ করছেন। ইতোমধ্যে তিনি নব্যন্যায়-যুক্তিতত্ত্বকে গাণিতিক ক্যালকুলাসে রূপান্তর করেছেন এবং বর্তমানে বৌদ্ধ যুক্তিবিদ্যা নিয়ে কাজ করছেন। পাশাপাশি 'বিউপনিবেশিত জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণ' প্রকল্পকে একটি আন্দোলনে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। সৈয়দ নিজার বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। পাশাপাশি তিনি